অপরাজিতা।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

"C nacter requires the exercise of many supreme qualities; such as truthfulness chasteness, mercifulness, and with these integrity, courage, virtue and goc lness in all its phases.' *Sami el Smiles.*

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥"

উদ্যোগপর্ব্ব। ৩৮।৭৪।

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮।৬৭।

কলিকাতা,

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মাঘ – ১২৯৬।

উৎসর্গ।

স্নেহময়ী ভগ্নী—শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী সরকার ও

শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র,

করকমলে।

তোমাদের স্নেহানুপ্রাণনে অপরাজিতার জন্ম। মানুষের স্নেহের সীমা আছে, মানুষের ভালবাসার পরিণাম আছে। কিসেরই বা শেষ নাই! সসীম মানুষের সবই অন্ত-বিশিষ্ট,—আজ আছে, কাল নাই। যত বয়স বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি, স্নেহ, দয়া, ভালবাসা,—এ সকল স্বর্গের জিনিসও, এখন, ভবের বাজারের ব্যবসার পণ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে;—আদান প্রদানের উপর নির্ভর করিতেছে;-একদরে কাচ ও হীরা ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং আজ মিলন, কাল বিচ্ছেদ! মানুষ আজ আপন,—কাল পর। এই পণের দ্বারা জগতের অশেষ প্রকার স্বার্থ সিদ্ধ হইতেছে,-বাসনার অনুরূপ পদার্থ সকল ক্রীত বিক্রীত হইতেছে। আমি ভবেরহাটে এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ের ভিড়ে পড়িয়া অনেক ঠকিয়াছি, অনেক ভুগিয়াছি। তাই এখন অন্তঃপুর বা আত্মপুরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এই অবস্থায়ও তোমাদের অপরাজিত স্নেহ ভুলিতে পারি নাই। তোমাদের স্নেহ ও দয়া আমার নিরাশা-দুর্দ্দিনেও কত আশার কথা শুনাইয়াছে; অপরাজিতাই তাহার সাক্ষী। আমি জানি, তোমরা পর কাহাকে বলে, শত্রু কাহাকে বলে, তাহা জান না। এই অপরাজিতাই তাহার জীবন্ত নিদর্শন।

এখনকার দিনে মতে মিলিলেই লোক আপন হয়, মতে না মিলিলেই লোক পর হয়। তোমাদের নিকট এরূপ ভাবের পরিচয় পাই নাই বলি

সময়ে সময়ে বড়ই সুখী হইয়াছি। সংসারের এই নিরাভরণা অপরাজিতা আর কোথায় স্থান পাইবে, জানি না। মতে মিলে নাই বলিয়া কত লোক ইহাকে ঘৃণা করিয়াছে; আরো কত লোক যে ঘৃণা করিবে, তাহাই বা কে জানে! তোমরা নাকি কাহাকেও পর ভাব না, এই জন্য অপরাজিতাকে তোমাদের স্নেহ-কোলে দিতেছি। যে দেশে আপন পরের বিচার নাই, সে দেশেও যদি আপন-পর-জ্ঞান-হীনা অপরাজিতা আদর মমতা না পায়, তবে আর কোথায় দাঁড়াইবে? বড় আশা করিয়া তোমাদের নামে ইহাকে উৎসর্গ করিলাম; দেখিও, স্নেহ-জলের অভাবে সংসার-মরুতে এই সদ্য-প্রস্ফুটিতা অপরাজিতা যেন দগ্ধ না হয়। তোমাদের নিকট আমার এই অনুরোধ—এবং ইহাই শেষ অনুরোধ।

আনন্দ-আশ্রম।
১৩ই মাঘ, ১২৯৬।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

অপরাজিতা

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত পথিক।

একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন অশ্বত্থ, প্রাচীন বট, বড় বড় তেঁতুল গাছ, বড় বড় আমগাছ গ্রামে অনেক আছে। এ ছাড়া ঝোপ ঝাপ, বাঁশবন, কাঁটাবনে গ্রামটী ঘেরা। প্রায় বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ অতি অল্প বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পায়, বায়ু প্রবেশের অধিকার আরো অল্প বাড়ীতে। জঙ্গলে শূকরের ভয়, বাঘের ভয় প্রচুর। সাপের ভয় আরো প্রচুর। গ্রামে লোকসংখ্যা অতি অল্প। এই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র একখানি বাড়ীর কথা বলিব।

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় এই বাড়ীতে আজ একজন পথ-হারা পথিক উপস্থিত। পথিক পথ-ক্লান্ত, তায় ক্ষুধা-পীড়িত, তায় ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। খুব উচ্চকণ্ঠে, ততোধিক মধুর কণ্ঠে ডাকিতেছেন—বাড়ী কে আছ গো?

একবার, দুবার, তিনবার, কিন্তু তবুও উত্তর নাই। পথিক আবার ডাকিয়া বল্লিলেন, এই অন্ধকার রাত্রে আমি পথ পাইতেছি না, ঘরে কে আছ, দয়া ক'রে দরজা খোল।

বাড়ীর ধার দিয়া গ্রাম্যপথ ঘনীভূত বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে।

দরজা খুলিল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, হাতে বাতি, খুব

কে, আপনি কোথায় যাইবেন?

পথিক বলিলেন—আমি বলরামপুর যাইব, আমার নাম দীননাথ উপাধ্যায়, রাত্রি অনেক হইয়াছে, রাস্তা পাইতেছি না। এ গ্রামের নাম কি? এখান হইতে বলরামপুর কতদূর?

বৃদ্ধা বলিলেন,—আপনি পথ ভুলিয়াছেন, আজ আর পথ পাইবেন, আশা নাই, কারণ পেছনে জঙ্গলের ভিতরে পথ ফেলিয়া আসিয়াছেন। এ গ্রামের নাম সোনাপুর, বলরামপুর দুই দণ্ডের ব্যবধান। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে এখানে আজ বিশ্রাম করুন।

এই কথা বলিয়াই স্ত্রীলোকটি ভাবিলেন, আমি স্ত্রীলোক, অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলা ভাল হইল কি?

পথিক।—এ বাড়ীতে কোন পুরুষ নাই?

বৃদ্ধা।—আছে, আমার পুত্রকে ডাকিতেছি। এই বলিয়াই পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে যাইয়া পুত্রকে ডাকিলেন। পুত্রের বয়স দ্বাবিংশ বৎসর অতিক্রম করিযাছে।

মায়ের ডাকে পুত্র জাগরিত হইলেন, এবং পথিকের নিকট আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া আর অধিক কোন কথা বলিলেন না, পথিককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, এতরাত্রে বলরামপুর যাওয়া দুষ্কর, পথ বড় দুর্গম, আজ এখানে থাকুন।

অপরিচিত লোকের বাড়ীতে এইরূপ অনুগ্রহ পাইয়া পথিক বড়ই বিস্মিত হইলেন। সন্ধ্যা হইতে আতিথ্যের জন্য অনেক বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহই স্থান দেয় নাই, কিন্তু এ বাড়ীর অভ্যর্থনায় তিনি বড়ই মোহিত হইলেন। তাঁহার পা অন্যপথে যাইল না, মুখে কথা সরিল না, চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা মাত্র জল পড়িল।

অতিথিকে পুত্রের নিকট বসাইয়া বৃদ্ধা নিজ হাতে রন্ধন করিতে যাইলেন। ঘরে বৃদ্ধার একটী মেয়ে, আর ঐ একটী ছেলে। মেয়েটী অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক, তাহাকে আর ডাকিলেন না। এখানি হরিভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী।

যতক্ষণ রন্ধন না হইল, ততক্ষণ পথিকের ধারে বসিয়া পুত্র নিম্নলিখিত রূপ নানা কথা বার্ত্তা বলিলেন।

পুত্র।—আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপ[illegible] কে[illegible]

পথিক।—সত্য কথা বলিতে চাই, কিন্তু বলিলে বড়ই বিপদ ঘটিতে পারে। কোন্ একজন ব্যক্তিকে বলিতেই হইবে, নচেৎ আর উপায় নাই, কেননা সেখানে আমার আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই। আপনাকে বলিলে কথা গোপন থাকিবে কি?

পুত্র।—আপনি পথিক, আমার বাড়ীতে আজ সুপ্রসন্ন, আমার দ্বারা আপনার কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনা নাই। নিঃসন্দেহ চিত্তে বলুন।

পথিক তবুও আপন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বলিলেন, আমার একটী আত্মীয় অনেক দিন দেশত্যাগী হইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তিনি বলরামপুরে আছেন, তাঁর অনুসন্ধানই প্রধান কার্য্য।

পুত্র আর কোন কথা বলিলেন না। পথিক আহারান্তে বিশ্রাম করিলেন। যত্ন বা ত্রুটীর কোন অভাবই হইল না।

পরদিন প্রত্যূষে পথিক বলরামপুর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কি ভাবিয়া যেন যুবককে ডাকিয়া তাঁহার কলিকাতার বাশার ঠিকানা জানাইয়া বলিলেন, বলরামপুর যাইবার আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে; ফিরিবার সময় সুবিধা পাইলে সবিশেষ বলিয়া যাইব। আবার বলিলেন, যদি কলিকাতায় যান, তবে যেন দর্শন পাই। পথিকের পরিধানে গৈরিকবস্ত্র, মস্তকে ঈষৎ লালবর্ণযুক্ত দীর্ঘ দীর্ঘ রুক্ষকেশ। মুখে যৌবনের পূর্ণবিকাশের চিত্র। সৌন্দর্য্য অপরিসীম। প্রাতঃকালে যুবকের সহিত পথিকের প্রকৃত সাক্ষাৎ হইল। যুবক পথিকের মুখে সহৃদয়তার জীবন্ত ছবি দেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিলেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। নিজের চিন্তা নিজের প্রাণেই গোপনে রহিল।

পথিক চলিয়া যাইবার একটু পরেই যুবকের ভগ্নী জাগরিতা হইলেন। প্রাতে ভাই ভগ্নী মায়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলেন, তারপর গৃহ কার্য্যাদিতে মনোযোগী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাজের গোলযোগ।

দুইদিন পর বলরামপুরে এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগের অনেক রূপ বিবরণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। সোনা-পুরে এই রূপ সংবাদ পৌঁছিল "এক বেটা বোম্বেটে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে আসিয়া তারিণী চক্রবর্ত্তীর বিধবা মেয়েকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছে।" কেহ বলিল, মেয়েকে লইয়া পলায়ন করিবার সময় ধরা পড়ি-য়াছে, এবং যথেষ্ট প্রহার খাইয়াছে। কেহ কেহ বলিল, সেই সন্ন্যাসী সোনাপুরের ৺ গঙ্গারাম ঠাকুরের পুত্র হরিদাস ঠাকুরের পরিচিত ব্যক্তি। এই সংবাদ সোনাপুর পৌঁছিলে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত হইল। হরিদাস ঠাকুরের অপরাধ, তার বাড়ীতে একজন পথিক দুইদিন পূর্ব্বের রাত্রিতে একবার অতিথি হইয়াছিল! রাষ্ট্র এইরূপ যে, সেই পথিকই ঐ সন্ন্যাসী। কথাটার ভাল ভাব কেহই গ্রহণ করিল না;—হরিদাসকে লইয়া সমাজে অযথা গোল বাধিল। পূর্ব্ব হইতেই লোকেরা হরিদাসের উপর একটু অপ্রসন্ন ছিল, এই ঘটনার পর হরিদাস সমাজে একঘ'রে হইলেন—ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। হরিদাস আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য কিছু চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বড় ভাল ফল ফলিল না। হরিদাস ভগ্নী ও মাতাকে লইয়া একঘ'রে হইলেন। গ্রামে বাস করা বড়ই কঠিন হইল, কিন্তু কি করেন, অবস্থায় কুলায় না, তজ্জন্য বিদেশ যাওয়া ঘটিল না। নির্যাতন ও অপমান অম্লান চিত্তে মস্তকে বহন করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের পিতা গঙ্গারাম ঠাকুর বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ, বিবাহ সূত্রেই সোনাপুরে বাস করেন। পূর্ব্বে বিত্ত সম্পত্তি কিছু ছিল, কিন্তু নিজের স্বভাবের উদারতার গুণে তাহার কিছুই নাই। এইরূপ জনশ্রুতি, গঙ্গারাম ঠাকুরের বাড়ীতে অতিথি আসিয়া কখনও ফিরিয়া যায় নাই। একমাত্র অতিথি সৎকারে বিত্ত আদি সমস্ত গিয়াছে। নানা স্থানে কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন, গঙ্গারামের শেষ অবস্থায়

তাহাতেই এক প্রকার চলিত। প্রায় তের বৎসর হইল গঙ্গারামের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় ১০ বৎসরের একটী পুত্র এবং চারি বৎসরের একটি কন্যা রাখিয়া যান। বলা বাহুল্য যে, গঙ্গারাম সোনাপুরের স্ত্রীতেই অধিক অনুরক্ত ছিলেন।

হরিদাস তখন গ্রাম্য টোলে পড়িতেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার তাহার মাথায় পড়িল, কিন্তু বালক কি বুঝে, কি জানে। স্বামীর কীর্ত্তিটা বজায় রাখিতে স্ত্রীর বড়ই ইচ্ছা। হরিদাসের মনেও সেই ইচ্ছা। কিন্তু অবস্থা নিতান্ত প্রতিকূল। কি করিলে কি হইবে, কিছুই ঠিক নাই। জননী কিন্তু পুত্র কন্যাকে বড় কিছু বুঝিতে দিলেন না, তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, এবং কতকগুলি অলঙ্কার ছিল, তদ্দারা কোনরূপে স্বামীর কীর্ত্তি বজায় রাখিলেন। অতি কষ্টে দিন গত হইতে লাগিল।

হরিদাসের মনে গাঢ় চিন্তা,—কি করিয়া কি করিব? ভাবিতে ভাবিতে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইল। বালকের মনে এত চিন্তা, এত ভাব দেখিয়া গ্রামের অনেক লোকই বিস্মিত হইল। পূজার সময় সোনাপুরের একজন বড় চাকুরে বাড়ী আসিলেন। তিনি হরিদাসের অবস্থার কথা শুনিয়া তাহাকে তাঁহার কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। যে কখনও ঘরের বাহির হয় নাই, এমন পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে জননী প্রথমে খুব আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু হরিদাসের একান্ত জেদে সে বাধা কাটিয়া যায়। সেই চাকুরে বাবুর নাম বিশ্বনাথ রায়। বিশ্বনাথ রায় একজন দয়ালু ব্যক্তি। ইহাঁর পুত্রের নাম বলরাম। বলরাম হরিদাসের বাল্যবন্ধু।

হরিদাস বিশ্বনাথ রায়ের সহিত অনেক দেশ পর্য্যটন করেন। সে সকল দেশ ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। হরিদাসের মস্তকের উপর দিয়া ২২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিয়া সোনার মানুষ হইয়া সোনাপুরে ফিরিয়াছেন। একদিক তাঁহার হৃদয়ে দয়া, সাধুতা, অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার বাহিরের বিনয়, মধুরপ্রকৃতি, সদাচার, তাঁহাকে দেবতুল্য করিয়াছে। হরিদাস নবীন বয়সেই একজন মানুষের মত মানুষ হইয়াছেন।

হরিদাসের জননী এই কয়েক বৎসর কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার নয়নের জলে ধরা সিক্ত হইত, কিন্তু হরিদাসের পত্র পাইলেই তিনি প্রসন্ন হইতেন। হরিদাস এই কয়েক বৎসর বিদেশে থাকিয়া জননী ও ভগিনীর মনে ধর্ম্মের এক অসাধারণ স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল কথা থাকুক। হরিদাসের পিতার সেই অক্ষয় কীর্ত্তি এখনও রহিয়াছে। অতিথি হইয়া কেহ বাড়ীতে আসিলে কখনও ফেরে না। হরিদাস যে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দারা পিতার কীর্ত্তি বজায় রহিল। এইবার অতিথি সেবাতেই সমাজে এই বিষম গোল উপস্থিত হইল। ভাল কাজে যে মন্দ ফল ধরে, হরিদাস কিন্তু এ বিশ্বাস রাখেন না, তিনি হরির লীলা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হরিদাসের প্রতি দেশের লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু বিরক্ত ছিল। তাহার কারণ, পাত্র জুটিলেও হরিদাস বাড়ী আসিয়া ভগ্নীর বিবাহ দেন নাই। এই জন্য সমাজের বড় বড় লোকেরা বিরক্ত ছিলেন। হরিদাসের মাতাকে এজন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু পুত্রকে অতিক্রম করিয়া জননী সাংসারিক এই মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছুক। হরিদাস বাড়ী আসিলে অনেকে তাঁহাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু তিনি উত্তর দেন, "আমি ঘর রাখিব না, কুল ভাঙ্গিয়া ভগ্নীর বিবাহ দিব।" এই কথাই সকলের বিরক্তির কারণ। তারপর আবার এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, হরিদাস সেই মেয়ে-চোর সন্ন্যাসীকে বাড়ীতে,আশ্রয় দিয়াছিলেন। সুতরাং সকলেই একযোট বাঁধিল। হরিদাস একঘ'রে হইলেন। এতদিন বিদেশে থাকিয়াও অর্থ সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত দরিদ্রই রহিয়াছেন, অর্থ সঞ্চয় করাকে পাপ কার্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। সুতরাং সমাজের এই অত্যাচারের দিনে তাঁহাকে কিছু কষ্টে পড়িতে হইল। হইল বটে, কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপ্রসন্ন হন নাই, হরির শেষ লীলা দেখিতে তাঁহার বড়ই সাধ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত বন্ধু।

দিন থাকে না, দিন যায়। কাহারও সুখ বা কাহারও দুঃখকে স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে না। হরিদাসের দুঃখের দিনও চলিতে লাগিল, কিন্তু এবার তিনি কিছু পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেন। সৎসাহস, তুমি কি তবে সময় পাইয়া হরিদাসকে ছাড়িয়া যাইবে? প্রসন্নতা, তুমি কি হরিদাসের মুখের সৌন্দর্য্যের মমতা ভুলিবে? হায়, হায়! দিনে দিনে সেই-রূপই হইয়া আসিল! পিতার কীর্ত্তিতেও একটু কলঙ্ক পড়িল। অতিথি বাড়ীর দিকে আসিতেছে দেখিলেই, হরিদাসের জাতি গিয়াছে বলিয়া লোকেরা নানা দুর্নাম রটনা করিত, সুতরাং দিন দিন অতিথির সংখ্যা কমিতে লাগিল। হরিদাস একটু চিন্তিত হইলেন।

মা ও ভগ্নীর কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সংসারের সমস্ত কার্য্য ইঁহারা অক্লান্ত অন্তরে করিতেন, তাতে কোন কষ্ট ছিল না। সমাজের লোকেরা ধোপা নাপিত ও নিমন্ত্রণাদি বন্ধ করিয়া ও নানাপ্রকার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়াও যখন ইহাদিগকে বিরক্ত করিতে পারিল না, তখন অতিথির মন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তারপর আরো যে সকল জঘন্য কাজে তাহারা লিপ্ত হইল, নিতান্ত অরুচিকর হইলেও সংক্ষেপে সে সকল না বলিলে এ দুঃখের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পল্লিগ্রামের বাড়ীতে প্রায়ই প্রাচীরাদি থাকে না, হরিদাসের বাড়ীতেও ছিল না। পাড়ার পুরুষ, পাড়ার মেয়েরা অক্লেশে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে, এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাইতে পারে। এই ঘটনার পর পাড়ার মেয়েরা দলে দলে যোট বাঁধিয়া আসিয়া হরিদাসের জননী ও ভগ্নীর সহিত ঝগড়া বাধাইতে চেষ্টা করিত। সামান্য সামান্য কথার উপলক্ষে নানারূপ অপমান করিত। সমবয়স্কা মেয়েরা দেখা হইলেই হরিদাসের ভগ্নীকে বলিত, "কিলো সোণার মেয়ে, তোরা নাকি খুব ভাল কাপড় ধু'তে শিখেছিস্, আমাদের কাপড় কখান ধুয়ে দিবি?" গিন্নিরা হরিদাসের মাকে বলিত, "কিগো ঠাকরুণ ছেলে মেথরের সহিত বিয়ে হবে নাকি? তা ভালই ত, ঘরের

মেয়ে ঘরেই থাক্‌বে, তা বেশ।" হরিদাসের জননী এইরূপ তিক্ত ব্যবহারেও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, এই সকল জঘন্য কথার একটিরও উত্তর দিতেন না। তাহাদের গৃহের সংবাদ, পরিবারের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া কথা উল্‌টাইতে চেষ্টা করিতেন। পাড়ার মেয়েদের মন তাতেও ফিরিত না। তাহারা সকলে মিলিয়া ইহাদের নামে ছড়া বাঁধিয়া গাইতে লাগিল। পল্লিগ্রামে দ্বিতীয় বিবাহের কাদা মাটীর দিনে মেয়েরা আহ্লাদে নানা অশ্লীল গান গাইয়া থাকে। হরিদাসের ভগ্নী এবং মায়ের নামের কুৎসাপূর্ণ ছড়া অতঃপর গ্রামের দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে সোনাপুরে গীত হইতে লাগিল। মেয়ে স্বভাব পরনিন্দা লইয়া থাকিতে অধিক ভালবাসে। যাহাদের আর কোন কাজ নাই, তাহারা আর কি করিবে? নিন্দার টনা গ্রাম্য মেয়ের কণ্ঠভূষণ। বলরাম, শ্রীনাথ প্রভৃতি হরিদাসের দুই চারিটী বাল্যবন্ধু ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহারাও হরিদাসের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিল। কি করিয়া কে তাহাদিগকে চটাইয়া দিল, হরিদাস কিছুই জানিলেন না; কিন্তু দেখিলেন, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হইয়া উঠিল। তাহারা পূর্ব্বে প্রায়ই হরিদাসের বাড়ীতে যাতায়াত করিত। হরিদাস যখন বিদেশে ছিলেন, তখনও তাহারা আসিত। হরিদাস এক সময়ে সকলেরই উপকার করিতেন, সকলকেই সাধ্যানুসারে ভাল বাসিতেন, তাহারাও এখন সময় বুঝিয়া প্রত্যুপকার সাধনে ব্রতী হইল! তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিয়া হরিদাসের ভগ্নীর চরিত্রের দোষ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইল! নিন্দুকের নিন্দা শুনিতে কে উল্লসিত নয়? তাতে আবার হরিদাসের নিন্দা! সমাজের অস্পৃশ্য চণ্ডালের নিন্দা পাইলে সকলেরই বুক ফুলিয়া উঠে। যাহারা হরিদাসের বাড়ীতে যাইত, তাহারা সত্য কথা বলিতেছে, ইহা অনেক ভাল লোকও মনে করিল। "এই জন্যই হরিদাস ভগ্নীর বিবাহ দিতেছেন না, দুপয়সা উপার্জ্জনের উপায় হইয়েছে" এইরূপ জঘন্য কথা বলিয়া অনেকেই ঠাট্টা তামাসা করিত। বন্ধুদের এই নিদারুণ ব্যবহারে হরিদাস বড়ই মনোকষ্ট পাইলেন; কিন্তু ইহাতেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। মনে ভাবিলেন, যাহা সত্য, তাহা একদিন প্রকাশ হইবেই হইবে। মিথ্যার ঢাক অনেক দিন বাজিবে না। ক্রমে কিন্তু তাহারা আরো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। এতদূর করিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন ভগ্নীর মন ভাঙ্গিবার জন্য পাষণ্ডেরা দল বাঁধিল। একযোগে হরিদাস

নিদ্রায় অচেতন আছেন। নানারূপ চিন্তায় তাঁহার শরীর, মন অবসন্ন। খুব অন্ধকার রাত্রি। এমন অন্ধকার যে নিকটস্থ পরিচিত লোককেও চেনা যায় না। এই রাত্রে হঠাৎ তাঁহাদের বাড়ীতে একদল পাষণ্ড প্রবেশ করিল। তাঁহার গৃহে বাতি জ্বলিতেছিল—বরাবর জ্বলিত। তাহাদের মুখে কালী মাখা, হাতে অস্ত্র, গায়ে কাল পোষাক। হরিদাস ঘুমের ঘোরে একটা বিকট চিৎকার শুনিলেন। সশঙ্কিত ভাবে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, কয়েক জন কোমর-বাঁধা লোক বলপূর্ব্বক তাঁহার হাত বাঁধিতেছে, এবং মুখ আবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একা হরিদাস, তাহাদের সহিত পারিবেন কেন? পারা দূরে থাকুক, চেষ্টাও করিলেন না। ঐ চিৎকার শুনিয়া জননীও জাগরিত হইলেন। হাত দিয়া অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, মেয়ে কাছে নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। জননীর নিদারুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে নৈশাকাশ তোলপাড় হইয়া উঠিল।

হরিদাস বুদ্ধিমান যুবক, অবস্থা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। ভগ্নীর প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস;—জীবন থাকিতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, জানেন, কিন্তু জীবন কি থাকিবে? হরিদাস অতি কষ্টে, এই দারুণ বিপদের সময়েও ধৈর্য্যকে বুকে বাঁধিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, ভগ্নীর জীবন কি থাকিবে? থাকুক বা না থাকুক, সে চিন্তা পরে, এখন আমি কি করি? ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে এইরূপ ভাবিলেন, জননীকে অধীর হইতে বা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। ধীরচিত্তে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন। ক্রোধ, উত্তেজনা, হিংসা, ঘৃণা এমন সময়েও হরিদাসের চিত্তে ঠাঁই পাইল না। এ কি মানুষ না পশু?

হরিদাসের ইষ্টদেবতা প্রসন্ন,—দেখিতে দেখিতে বিপদ কাটিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে এক দীর্ঘকায় মানুষ হরিদাসের ভগ্নীকে কোলে করিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—হরিদাস, সমাজের অনুরোধে অনেকবার তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, কিন্তু এই সময়ে আর পারিলাম না, তোমার ভগ্নীকে ধর, আমি এখনই চলিলাম, পাষণ্ডেরা আবার লোকজন সংগ্রহ করিতেছে, আমি চলিলাম। হরিদাস দেখিলেন, শ্রীনাথের বস্ত্রাদি সব রক্তময়। হরিদাসের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল [illegible] মাকে বলিলেন, "মা দেখ, কার উপায় কে করে! কিন্তু আমি

আর থাকিতে পারি না, তুমি তোমার মেয়েকে ধর, আমি আসিতেছি। এই বলিয়া হরিদাস শ্রীনাথের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অধর্ম্মের পরাজয়।

একটা বড় মাঠ,—তার মধ্যে একটা বড় বটবৃক্ষ। সেই মাঠের মধ্যে বট বৃক্ষের তলায় একজন যোগীর কুড়ে ঘর বা আশ্রম। যোগী দুই বৎসর সোনাপুরে আসিয়াছেন, কিন্তু এমন দলাদলির প্রকোপ আর কখনও দেখেন নাই। দলাদলির প্রকোপে কয়েক দিন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। রাত্রে সেই বট-বৃক্ষের তলায় সেই কুড়ে ঘরে বসিয়া যোগী ক্ষীণ দীপালোকে একখানি প্রাচীন কীটদষ্ট পুস্তক পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলিল, এবং আপন শরীরের ক্ষত সকল দেখাইল। তাহার পশ্চাৎ হইতে হরিদাসও সে সমস্ত কথার পোষকতা করিল। সে সকল কথা শুনিয়া যোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; বলিলেন, কি এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমি এখনই যাইতেছি।

সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধারী, জটাজুটধারী, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আপন তেজে বীরদর্পে শ্রীনাথের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। দূর হইতে শ্রীনাথ লোকের কোলাহল শুনাইল এবং বলিল, "দেব! অনাথ-পরিবারের মান সম্ভ্রম সকলই আজ আপনার হাতে। যা আপনার ইচ্ছা।"

যোগী রামানন্দ তীর্থস্বামী বুঝিলেন, অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। তিনি নির্ভয় চিত্তে শ্রীনাথ ও হরিদাসের সহিত সেই সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকেরা রামানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইল। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত। তাহারা বলিল, দেব, আপনি শ্রীনাথের ব্যবহার দেখুন, দুই জন লোককে গুরুতররূপে আহত করিয়া পাষণ্ড কি ভয়ানক কাজ করিয়াছে!—আপনার উপর বিচারের ভার, যাহা ইচ্ছা করুন।

স্বামীর মন পূর্ব্ব হইতেই একদিক টলিয়াছিল, বলিলেন," আমি সকলই বুঝিয়াছি,—কে সৎ আর কে অসৎ, জানি। তোদের নরক ভিন্ন আর গতি

নাই—সমাজ কি এতই অধঃপাতে গিয়াছে যে, লোকের মান ইজ্জত থাকিবে না? আমি দেখিব, পাপেরদণ্ড বিধান হয় কি না? তারপর বলিলেন, "শ্রীনাথ, ইহার মধ্যে কে কে অপরাধী, বল, আমি তাদের শরীরের রক্তে আজ এ গ্রামের অপবিত্রতা দূর করিব। অনেক সহিয়াছি, আর পারি না।

সেই আগুন, সেই তেজ ও সেই সাহসপূর্ণ কথায় সকলের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু একজন লোকের হৃদয় কিছুতেই দমিল না। সে গর্ব্বিত স্বরে বলিল,—"আমিই অপরাধী, সাধ্য থাকে, এস, কার কেমন শক্তি বুঝি।"

স্বামীজীর ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু শ্রীনাথ গতিরোধ করিল. পা ধরিয়া বলিল দেব, যার তার কথায় কাজ কি, এই অপবিত্র কাজে হস্ত কলুষিত করিয়া লাভ নাই; আমি বুঝিয়াছি, আজ আর কেহ সেই পবিত্র অবলার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহসী হইবে না, চলুন, আমরা এখন তাঁহার নিকট যাই; জানি না, তিনি এখন জীবিত বা মৃত!

স্বামী নিরস্ত হইলেন। স্বামীর প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করার দরুণ গ্রামের লোকেরা বলরামের প্রতি নানারূপ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে করিতে আপন আপন গৃহে ফিরিল।

শ্রীনাথ ও রামানন্দস্বামী হরিদাসের সহিত তাহাদের গৃহে চলিলেন।

তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, তখনও হরিদাসের ভগ্নীর চেতনা লাভ হয় নাই, মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। জননী মস্তকে জল সিঞ্চন করিতেছেন, আর দুনয়নের ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

রামানন্দ স্বামী জননীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভগ্নীর শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই। অক্ষয় কবজে ইহার ধর্ম্ম বাঁধা, ইহার জীবনে কোন ভয় নাই, আমি চলিলাম।" রামানন্দ স্বামী চলিয়া গেলেন। শ্রীনাথের কৃপায় ও বিধাতার আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মের ভরা আজও অক্ষুণ্ণ রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের জয়।

পরদিন রামানন্দ স্বামী আবার সুস্থ-চিত্তে যোগে বসিলেন, এদিকে গ্রামের লোকে চুপে চুপে শ্রীনাথের নামে মকদ্দমা উপস্থিত করিল। সব লোক এক পক্ষে, সুতরাং সে মকদ্দমায় শ্রীনাথের মেয়াদ হইল। হরিদাসের হৃদয়ে একটা দারুণ শেল বিঁধিল। এদিকে নানালোক বলরামকে মাতাইয়া তুলিল, সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পরিল না, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ রায় বিদেশে, তিনি এ সকল চক্রান্তের কোন সংবাদ পান নাই। প্রথমতঃ তার লক্ষ্য রামানন্দ স্বামীর প্রতি ধাবিত হইল; কিন্তু কিছুতেই অনিষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইল না। তিন রাত্রি সে শাণিত তরবারি লইয়া সেই বটবৃক্ষ তলায় সেই কুড়েঘরবাসীর অঙ্গে আঘাত করিবার মানসে গিয়াছে, কিন্তু এক দিনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পা চলে ত মন চলে না, মন চলে ত পা চলে না। পা ও মন যে দিন চলিয়াছে, সে দিন হাত চলে নাই। স্বামীর শরীরে আঘাত করিতে প্রতিদিনই তার পা, মন নয় হাত কাঁপিয়া গিয়াছে! কি মুস্কিল, ধার্ম্মিকের প্রতি প্রতিহিংসাও করা যায় না, বলরাম দিবারাত্রি এই কথাই ভাবিতেছে।

তার পর সে হরিদাসের কথা ভাবিল। একটা কিছু না করিলে তার মন সুস্থ হয় না। কিন্তু হরিদাস তার কি অনিষ্ট করিয়াছে? হরিদাস তার পিতার আশ্রিত লোক; একদিনও তার নিন্দা করে নাই, কোন দিন ভ্রমেও তার অনিষ্ট করে নাই, কখনও একটি রূঢ় কথাও ব্যবহার করে নাই; তবে তাকে কেন মারিব? বলরাম ভাবিতেছে, যত গোলের মূল হরিদাস ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথ দল ভাঙ্গিয়া হরিদাসের উপকার করায় জেলে গিয়াছে, হরিদাস এখনও আছে! বলরামের প্রাণে তা সয় না। সে অগত্যা হরিদাসের বিরুদ্ধেই অস্ত্র-শাণিত করিল এবং সুযোগ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন, দুদিন, দশদিন, কিন্তু ভাল সুযোগ আর মেলে না। কি দায়, হাতের অস্ত্র হাতেই থাকে, হরিদাসের মাথায় আর পড়ে না। বলরামের মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল।

সে ঘর ছাড়িয়া রাস্তা ধরিল। যে পথ দিয়া হরিদাস যাতায়াত করিতেন, প্রত্যহ সেই পথে আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিত। একদিন দৈবে বড় সুযোগ উপস্থিত। সন্ধ্যাকাল, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, একটু একটু আঁধার আকাশ ছাইয়াছে, রাস্তায় একটু একটু কাদা হইয়াছে। রাস্তায় আর লোক নাই,—একাকী হরিদাস চলিতেছেন। বলরাম বৃক্ষের আড়াল হইতে দেখিল এবং সুযোগ গণিল। সে বুকে সাহস বাঁধিল, এবং খুব শক্ত করিয়া অস্ত্র ধরিল। পশ্চাৎ হইতে একজন পথিক এই ঘটনা দেখিল। সে ছুটিয়া আসিতে না আসিতে হরিদাসের উপর বলরাম পড়িল, কিন্তু অস্ত্র উঠাইবার পূর্ব্বেই হরিদাস ফিরিয়া দেখিলেন, বলরাম তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত! হরিদাস অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "ভাই বলরাম, মারিবে, মার, আমি তোমার কাছে ভাই বড় অপরাধী আছি, মার।" বলরাম বয়সে হরিদাসের ছোট, কিছুদিন পূর্ব্বেও হরিদাসের খুব নিকটস্থ বন্ধু ছিল। মানুষের হৃদয়ে লজ্জা না থাকিলেও চক্ষে নাকি বিধাতা লজ্জা দিয়াছেন, তাই বলরাম আর পারিল না, সে অস্ত্র রাখিয়া হরিদাসের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। হরিদাস হাসিয়া বলিলেন, ছি পাগল, পা কি ধরিতে আছে? ইত্যবসরে পশ্চাতের সেই লোক নিকটে আসিল এবং সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বলরামের দক্ষিণ হস্তে গুরুতর রূপে আঘাত করিল। এত অল্প সময়ে এই ঘটনা ঘটিল, যে, হরিদাস কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না। হরিদাস দেখিয়া অবাক হইলেন, এ সকল কাহার লীলা ভাবিতে লাগিলেন, পথিক কিছু না বলিয়া আপন পথে আপন মনে চলিয়া গেল। হরিদাস আঁধারে চিনিতে পারিলেন না।—অবশ হস্তে ধরিতেও পারিলেন না। তিনি বলরামকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের গৃহে চলিলেন। হরিদাসের অপরাজিত দয়া ও ভালবাসার পরিচয়ে বলরাম লজ্জায় মৃতবৎ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভাই বোন্।

এ সকল বাহিরের ঘটনায় হরিদাসের কোনই অধৈর্য্যের পরিচয় নাই বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতরে, কঠিন আবরণে, অল্পে অল্পে একটু একটু ক্রোধ ও হিংসা উপ্ত হইল। হরিদাস গ্রামের দলাদলির আর সকল কথা ভুলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ভগ্নীর প্রতি সেই রজনীর সেই নির্ম্মম ব্যবহার হৃদয়ে ক্রমে একটা বিশাল চিন্তার ছায়া বিস্তার করিল। যে গ্রামে মানুষের ধর্ম্ম ইজ্জত বজায় রাখা দায়, সেই গ্রামে বাস করা কি উচিত? প্রেমের কলি অথবা স্বর্ণকলি,—স্নেহের পুত্তলি, পাপ প্রলোভনের অস্পৃশ্য কুসুম, তার প্রতি এত দুর্ব্যবহার!! হরিদাস এই চিন্তায় দিনদিন যেন কেমন হইয়া উঠিলেন। যে দিন আহত বলরামকে ক্রোড়ে লইয়া হরিদাস তাহাদের গৃহে গেলেন, সে দিনও হৃদয় এই চিন্তায় কাতর ছিল, কিন্তু অপরাজিত দয়ার উত্তেজনায় তাহা অপ্রকাশিত ছিল। হরিদাস সাধ্যানুসারে বলরামের সুশ্রুষা করিলেন। পরম আত্মীয়ের ন্যায় আরোগ্য করিলেন, কিন্তু মনের ঐ চিন্তা, কঠিন কপটতার আচ্ছাদনে, পূর্ব্বের ন্যায় চাপা রহিল।

ভগ্নী স্বর্ণকলি, হরিদাসের বড় আদরের পুঁটী, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। স্বর্ণকলি স্বভাবের মেয়ে, যে আপন পর বুঝেনা;—অত্যাচার অপমান কাকে বলে, জানে না;—যে সকলকেই আপন ভাবে, সকলকেই কাছের জন মনে করে। তার প্রকৃতিতে কপটতা বা অসরলতা, হিংসা বা দ্বেষ, ক্রোধ বা অভিমান—এ সকলের কিছুই নাই। দারুণ কষ্টেও তারমুখে অস্ফুট হাসি, নয়নের অনিন্দিত শরমের ভিতরে সদা উদ্ভাসিত।—যৌবনের অপরূপ শোভায় উহা আরো অপরূপ হইয়াছে;—স্নেহময়ী মায়ের কোলে প্রেমের কি এক স্বর্গীয় কলি ফুটিতেছেন! স্বর্ণকলির ধারে আসিয়া কেহ আর তাহাকে পর ভাবিয়া যাইতে পারে না। অথবা কেহ ভাবিতে অবসর পায় না, কে তার অধিক ভালবাসার পাত্র, কে নয়। স্বর্ণকলি দাদার মনে একটু অস্বাভাবিক ভাব, একটু হিংসা, ও একটু ক্রোধের পরিচয় পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

বলরাম আরোগ্য হইল, সে আর দলাদলিতে যোগ দিতে পারিল না, তার প্রাণের ভিতরে কি এক চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে ;—সে দিবারাত্রি কেবল হরিদাসের কথা ভাবিতেছ। হরিদাসের ন্যায় পরোপকারী লোক কি আর মিলে, ইহা তাহার জপমন্ত্র হইয়াছে। কি করিলে হরিদাসের মঙ্গল সাধন করা যায়, এখন তাহাই তাহার প্রধান চিন্তা হইয়াছে। অন্যান্য যুবার দল হিংসার উত্তেজনা ভুলিতে পারিল না। দেশের সেই হট্টগোলে আবার যোগ দিয়া হরিদাসের মহা অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইল। চক্রান্তে যাহা হইবার, হইতে লাগিল। কোন দিন রান্নাভাতে হঠাৎ কতকগুলি ছাই ফেলিয়া পলাইল, কোনদিন বা একটা মড়া গরুর মাথা বাড়ীতে ফেলিয়া দিল। কোন দিন বা বাড়ীতে কতকটা বিষ্ঠা পড়িল, এইরূপ কোন না কোনরূপ উৎপাত প্রত্যহই চলিতে লাগিল। কথা বলিবার পর্য্যন্ত লোক নাই ; সোনাপুরের প্রায় সকলেই হরিদাসের ঘোর শত্রু। এ সকল ব্যবহার সহ্য করিতে হরিদাসের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু সেই রজনীর পর হইতে স্বর্ণকলিকে ধর্ম্মভ্রষ্টা বলিয়া যে লোকেরা গালি দেয়, তাহা তিনি কোনরূপেই সহ্য করিতে পারেন না। স্বর্ণকলিকে লোকে যা মনে আসে, তাই বলিয়াই গালাগালি দেয়! ধর্ম্মভ্রষ্টা, কুলটা, ব্যভিচারিণী—এ সকল কথা সোনাপুরের লোকের মুখে শুনিলে হরিদাস আর স্থির থাকিতে পারেন না। ভগ্নীর জন্য হরিদাস অল্পে অল্পে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন ; কোন কোন স্থলে দুই একটি মিথ্যা অপবাদের উত্তরে অন্য ঘরের কুৎসাও রটাইতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত কাজ আর কি আছে? কিন্তু মনের আগুন তাহাতেও নিবিল না।

ভগ্নী স্বর্ণকলি এ সকলই বুঝিতেছেন। দাদার স্বভাবের সমতা রক্ষা পাইতেছে না, বলিয়া তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তাই জননীকে সময়ে সময়ে তিনি দুঃখ করিয়া কত কথাই বলেন : "হায় দাদা বুঝি পাগল হলো, আমার দাদা বুঝি আর ঠিক থাকিতে পারিল না"—সর্ব্বদাই স্বর্ণকলি এইরূপ দুঃখের কথা বলিতেন।

একদিন দাদা একথা শুনিলেন। শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তার আদরের পুঁটী তার হৃদয়ের ভাব কেমনে জানিতে পারিল, ইহা ভাবিয়া হরিদাস আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি জানেন না, তাঁর পুঁটী দিন দিন কঠোর সংসার-পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া কতদূর সহিষ্ণু, কতদূর বুদ্ধিমতী হইয়া উঠিয়াছেন। হরিদাস

বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। স্বর্ণকলিকে বলিলেন, পুঁটি, তুই কেমনে জানিলি যে, আমি পাগল হব ?

স্বর্ণকলি বলিলেন, দাদা, তুমি জান না যে, তোমার হৃদয়ের ভাব বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। সকল মানুষেরই এইরূপ হয়। ভিতর কি ঢাকা থাকে ? ছি, দাদা, তুমি এত কুৎসিৎ চিন্তা লয়ে থাক কেন ?—তোমার জন্য ভেবে ভেবে মা যে দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন ;—দাদা, কেন এত ভাব ?

হরিদাস হৃদয়ের কথা আজ আর খোলাপ্রাণ স্বর্ণকলির নিকট গোপন রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন, পুঁটি, আমাকে যে যা বলে সব সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোর চরিত্রের মিথ্যা কলঙ্ক রটনা শুনিলে আমার আর সহ্য হয় না। আমি জানি না, আমি আর কতদিন ঠিক থাকিতে পারিব !

স্বর্ণকলি বলিলেন, ছি দাদা, তোমার মুখে আমি এ কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। লোকে যে যা বলে, বলুক, লোকের কথায় ত আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, হাওয়ার কথা হাওয়ায় মিশায়, তাতে তুমি কেন অধীর হবে ? ছি, তুমি কেন আত্মহারা হবে ? না—দাদা, সত্যই বলি আমি তোমাকে এমন হতে দিব না।

হরিদাস পুনঃ বলিলেন,—পুঁটি, তুই ত দাদা হয়ে আমার অবস্থা কখন ভাবিস্ নাই, আমার অবস্থা কি বুঝিবি ? আমি কি ইচ্ছা করে এমন হই ? যখন জ্ঞান থাকে না, তখনই অধীর হই, নচেৎ আমাকে আর কে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে ? আমি পারি না, তার উপায় কি বল্ ত ?

স্বর্ণকলি স্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন, দাদা, তুমি যে হরির নাম এত ভালবাস, সেই নাম স্মরণ করিয়াও ঠিক থাকিতে পার না ?—জান না কি, তিনি নিরুপায়ের উপায় ? জান না কি, তিনি যা করিবেন, তাহাই হইবে। যশ মান না থাকে, না থাক্ ; অনাহারে মারেন, মারুন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমরা ছার সংসারের জীব, কেন ভেবে ভেবে সারা হবো ! তাঁর যা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক।

হরিদাস ভগ্নীর মুখে এইরূপ গভীর উপদেশপূর্ণ কথা শুনিয়া মিটি মিটি হাসিলেন, প্রাণে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এই নিষ্কলঙ্ক চাঁদে লোকেরা অযথা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, লোকদের কি সাহস, কি আস্পর্দ্ধা ! ছি, এমন

দেশে কি মানুষের থাকিতে আছে? মনের কথা এবার বাহির হইল, ঢাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, বোন্, হরির ইচ্ছা, আমরা এ দেশ ছাড়ি, নচেৎ এত নির্যাতন কেন উপস্থিত হইতেছে?—তিনি কি কষ্ট যন্ত্রণার হাত হতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন না? তবে কেন এত নির্যাতন হইতেছে, আর কেনই বা তাহা আমরা সহ্য করিতে কাতর হইতেছি, বলত বোন্? হরির ইচ্ছা, আমরা আর এ রকমে না থাকি! তবে কেন থাকিব বোন?

স্বর্ণকলি দেখিলেন, এ আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, বলিলেন, দাদা, কষ্ট মনে করিলেই কষ্ট, নচেৎ আর কি?—এ সকল পরীক্ষা এইজন্য যে, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি কি না, তিনি জানিতে চাহেন। যেখানে যাইব সেখানেও তিনি, এখানেও তিনি,—তিনি এখানে কষ্ট দেন, সেখানে যে দিবেন না, কে জানে? তাঁর মহিমা অপার। আমাদের সহ্য করা বই আর উপায় নাই। দাদা,—তুমি এত অল্পেই এত অধীর হইলে কেন? তোমার জন্য আমার বড়ই ভয় হয়!

স্বর্ণকলি ও হরিদাসের এইরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময়ে জননী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মাকে দেখিয়া স্বর্ণ প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, "মা, দাদা দিন দিন কেমন মলিন হইতেছেন, দেখ, দাদার মনে কেবল বিষ, কেবল ভাবনা। মা, আমরা হরির উপর নির্ভর করে সকল ভাবনা চিন্তার কি অতীত হ'তে পারব না?—বল না মা, পারব কি না?"—"আমি বলিলেই যেন সব অসম্ভব সম্ভব হইবে! স্বর্ণের স্বভাব কি মিষ্ট, প্রকৃতি কি মধুর, হরির প্রতি তার কেমন অচলা বিশ্বাস" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জননী মেয়েকে বলিলেন, "তাঁকে যখন প্রাণ সঁপেছি, তখন আর ভাবনা কিসের? হরিদাসের কেন এত ভাবনা, তা ভেবেই আমি অস্থির।" পুত্রকে বলিলেন, "হরিদাস, বাবা, পুঁটীর চেয়েও তুমি অধীর হলে? ছি, আমি পাড়ায় শুনে এলেম, তুমি নাকি কতকগুলি মুসলমান লয়ে একটা প্রকাণ্ড দল বেঁধেছ, সকলকে মেরে সকলের ঘরে আগুন দিয়া তুমি পালাবে, এইরূপ নাকি মনে স্থির করেছ? শুনে আমার প্রাণ কাঁপছে। ছি, বাবা, এ সকল ছেলেমি, এ সকল অসৎ কার্য্য তুমি করিবে, স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। কেন বাপ, তুই এমন হলি?

হরিদাস বলিলেন, মা, যা শুনেছ, সবই সত্যি, যা ইচ্ছা বল, আমি পুঁটীর চরিত্রে দোষারোপ সহ্য করতে পারব না, ধর্ম্মকর্ম্ম সব চুলোয় যা'ক, আমি এবার একবার শক্তির পরীক্ষা করব। দেশের লোকগুলো ভেবেছে কি? হরিদাসের কথা শুনিয়া জননীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, শুনা কথা সব সত্য! হরিদাসের এতদূর অধঃপতন!! জননীর নয়ন হইতে টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হরিদাস মনের আবেগে আবার বলিতে লাগিলেন, মা, তুমি জান না, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু পুঁটীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হতে দিতে পারি না। যা থাকে হবে, আমি একবার ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব।

হরিদাসের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, জননী সে মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। স্বর্ণকে লইয়া পৃথক ঘরে যাইয়া দরজা আবদ্ধ করিলেন, এবং চুপিচুপি সেই নির্জ্জন গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, হরি হে, তুমি এ কি করিলে? সোনার ভরা ডুবাবে? ছি, এ তোমার কি লীলা!

ভগ্নী স্বর্ণকলিও বলিলেন, হরি, এ তোমার কি লীলা!

সে দিন আর বাড়ীর কাহারও আহারাদি হইল না। অতিথি-সৎকারও হইল না। অনেক দিনের সুপ্রথায় আজ কণ্টক পড়িল, এতদিনের পর দুই একজন অতিথি ভগ্নমনে ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞার দুর্জ্জয় পরাক্রম।

মা ও ভগ্নীর চক্ষের জলে হরিদাসের মন ভিজিল না। টাকা যা'ক, ঐশ্বর্য্য যা'ক, বাড়ী ঘর সব যা'ক,—তাতে হরিদাসের কোনই কষ্ট নাই, কিন্তু তিনি নির্ম্মলহৃদয়, অপরাজিত স্নেহের ফুল স্বর্ণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ সহ্য করিতে পারেন না। সমস্ত দিনের অনাহার, সমস্ত দিনের উত্তেজনায় আরো শক্তি সংযোগ করিল।

অতিথি-সৎকার পিতার একমাত্র চিরোজ্জ্বল সংকীর্ত্তি, তাহাও রহিত হইতে চলিল, ইহাতেও প্রাণ কেমন হইয়া উঠিল। ধন ঐশ্বর্য্য গেল, পিতার সৎকীর্ত্তি লোপ পাইল, পরোপকারব্রত শ্মশানে ভস্মীভূত হইল—তারপর মানুষের পরম আদরের ধন চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্ক আরোপিত হইল, হায়! হরিদাস আর কি লইয়া সুস্থ থাকিবে?—আর কি লইয়া জীবনের বাসনা রাখিবে,—আর কিসের আশায় সোনাপুরে মন বাঁধিবে? হরিদাস আজ উন্মত্ত। শাণিত অস্ত্র আরো শাণিত করিল। হরিদাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—জীবনের বিনিময়ে জীবন লইবে, শিরের বিনিময়ে শির লইবে—আপনাকে ভগ্নীর চরিত্র রক্ষার নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে। প্রতিজ্ঞা এই—যাহারা স্বর্ণকলির চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছে, তাহাদিগের মস্তক ধূলায় বিলুণ্ঠিত করিবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিত্যসহচরী অদম্য সাহস, তাহা আজ হরিদাসের প্রাণে জাগিয়াছে। হিংসার চিরসহচরী অদম্য ক্রোধ, তাহা আজ সময় বুঝিয়া হরিদাসকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ বহিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে,—চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। কাহারও নিষেধ বাক্য তাহার নিকটে আজ ভাল লাগিতেছে না; মাতা ও ভগ্নীর চক্ষের জল পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বর্ণকলি আজ ভ্রাতার উত্তেজিত শক্তির নিকট পরাস্ত—প্রেম আজ ক্রোধের নিকট অপদস্থ। হরিদাস শাণিত অসি হস্তে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার আজ সময় বুঝিয়া তাঁহার সহায় হইল, চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ প্রকৃতি সময় বুঝিয়া আজ আর তার কাজের যেন প্রতিবন্ধক যোগাইল না। হরিদাস আগুন হস্তে আগুন হৃদয়ে লইয়া নির্ভয়ে গৃহের বাহির হইলেন। সে তেজ, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সে ক্রোধ—ভাষায় ব্যক্ত হয় না। যাইবার সময়, এই বিষম সময়েও, হরিদাস, হরির নাম স্মরণ করিলেন। যাহা ঘটিল, তাহাই লিখিতেছি, অসম্ভব কি সম্ভব, সমালোচক পাঠক সে বিচার করিতে থাকুন। হরিদাস এই দারুণ উত্তেজনার সময়ও হরির নাম স্মরণ করিতে ভুলিলেন না।

আর একটী কথা। এত ক্রোধের উত্তেজনা, এত সাহসের তাড়না, এত হিংসার প্রকোপ, কিন্তু হরিদাসের বুদ্ধির ব্যতিক্রম নাই। তাঁহার নিজের জীবন লইবার জন্য বলরাম চেষ্টা করিয়াছিল, বলরামের প্রতি তাঁহার একটুও ক্রোধ নাই। হরিদাসের স্বভাবের যাহারা নিন্দা করিয়াছিল,

তাহাদের প্রতি হরিদাসের আশ্চর্য্য ক্ষমা। সে সকলেই আজ দয়ার পাত্র। আপনার জন্য হরিদাসের কোনই মান সম্ভ্রম নাই। হরিদাস অনেক দিন আপনাকে বলি দিয়াছেন। আজ অবশিষ্টাংশ ভগীর জন্য বলি দিতে যাইতেছেন। হরিদাসের বিশ্বাস, যে সকল ব্যক্তি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীর চরিত্রে দোষারোপ, অম্লান চিত্তে, শীতল রক্তে সহ্য করিতে পারে, তাহারা নরাকারে পশু বিশেষ। এই বিশ্বাসেই একদব হইয়াছে। নিজের ধারণায় যে চলে, হিংসা, ক্রোধ তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্ট করিতে কখনও সমর্থ হয় না। হরিদাস সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে নির্ভয়ে তাঁহার লক্ষ্য পথে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় বিপক্ষদলের লোকেরা একস্থানে প্রত্যহ মিলিত হইত, হরিদাস একেবারে সেই স্থানে উপস্থিত। অতি অল্পসময়ের মধ্যে চকিতের ন্যায় তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ হইল—চারিজন লোক নিমেষের মধ্যে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ স্বর্ণকারের চরিত্র লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কেহ চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে নিস্তব্ধ সান্ধ্য আকাশ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। হরিদাসকে কেহ দেখে নাই—কেহ চেনে নাই। লক্ষ্য সিদ্ধ করিয়া পুকুরের মৃত্তিকায় শাণিত অসি নিক্ষেপ করিয়া হাত ধৌত করিলেন ; এবং প্রশান্ত চিত্তে সেই বটবৃক্ষের নিম্নের কুঁড়েনিবাসী যোগীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন রক্ত শীতল হইয়াছে, শরীরের গ্লানি কমিয়াছে,—মন কতক শীতল হইয়াছে। যোগী তখন সান্ধ্য-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। হরিদাস আস্তে আস্তে যোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এক ঘণ্টা পূর্ব্বের হরিদাস এ নহে। গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি যোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। ক্রমে হরিদাস অল্পে অল্পে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

হরিদাসের কিসের ধ্যান ? এ সময়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান অসম্ভব, লোকেরা বলে ; হরিদাস সম্বন্ধেও তাহা ঠিক হইল। হরিদাস অবসর পাইয়া সেই নিস্তব্ধ স্থানে ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিলেন—এখন কি করিব ? ভগ্নীর চরিত্রের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছি,—কিন্তু তাহার জীবনের পথ পরিষ্কার করি নাই। ইহাদের উপায় কি হইবে ? কি খাইবে, কি পরিবে, আমাকে হারাইয়া ইহারা কি লইয়া থাকিবে ? পিতার অতিথি-সৎকার প্রথা ভুলিয়া কেমনে জীবন ধারণ করিবে ?—ইহার পরই মনে হইল, আজ মা ও ভগ্নী সমস্ত দিন কিছু আহার করে নাই। তাহাদের অন্নাহারের

কথা ভাবিয়া হরিদাস ধারাবাহী অশ্রু ফেলিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বর্গে দয়া ও স্নেহ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। হরিদাস আর ধ্যানস্থ নন, বালকের ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন।

সে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে অজ্ঞাতসারে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। যোগী সকচিত হইয়া দেখিলেন, হরিদাস পার্শ্বে উপবিষ্ট. দেখিলেন, সে ধ্যানস্থ, দেখিলেন, তার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী জল পড়িতেছে. দেখিলেন, সে আত্মহারা হইয়া গভীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছে। গৃহে মৃদু দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতেই এ সকল দেখিলেন। যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া দীপ উস্কাইয়া দিয়া সে স্বর্গীয় রূপ একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, হরিদাসের বক্ষে স্থানে স্থানে অশুষ্ক শোণিত-বিন্দুর চিহ্ন রহিয়াছে। যোগী শিহরিয়া উঠিলেন, তারপর বলিলেন, "হরিদাস, তোমার আজ এ কি রূপ বেশ দেখিতেছি?

হরিদাস সহসা যেন ঘোর সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইলেন। আত্মহারা ভাবে বলিলেন,--"আমি ঘোর অপরাধী, আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি.—আমি আজ চলিলাম।"

কোথায় যাইবে?—কি অপরাধ করিয়াছ?—যোগী স্নেহ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদাস ধীর ভাবে সকল কথা বলিলেন। যোগী সমস্ত কথা অমানুষিক ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিলেন, নর-হন্তাকেও দেবতা বলিয়া বোধ হইল। তিনি সহসা হরিদাসকে প্রণাম করিলেন :—তারপর বলিলেন—"তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার অবারিত রহিয়াছে,—বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া তুমি স্বর্গধামে যাও। আমার কার্য্য সমাধা করিয়া তোমার সহিত সেখানে মিলিব। অধিক কথা হইবে না। আমার অনেক কাজ আছে।

যোগী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, স্বর্ণকলি এবং তাঁহার মাতার আহার হয় নাই।

হরিদাস যোগীর ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইলেন। নর-হন্তাকে ঘৃণা করে না, এমন লোকও জগতে আছে। নর হন্তাকে আদর করিয়া স্নেহের কোলে আলিঙ্গন করে, এমন ব্যক্তি সোনাপুরে আছে? হরিদাস মনে মনে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, হরি হে, তোমার অপার দয়া, বুঝিলাম, তুমি কাহাকেও ঘৃণা বা পরিত্যাগ কর না। তারপর যোগীকে

বলিলেন,—"দিব, তবে আমি চলিলাম, বিপন্ন পরিবারের ভার আপনার উপর রহিল, যাহা হয় করিবেন। একটী উপদেশ চাই ;—আমি আত্মগোপন করিব, না পুলিসের কাছে ধরা দিব, না দেশত্যাগী হইব ?

যোগী বলিলেন,—ইষ্টদেবতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে। আমার আর সময় নাই, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া যোগী আপন কর্ত্তব্য পালনের জন্য কুটীর পরিত্যাগ করিলেন। হরিদাস ক্ষণকাল সেই কুটীরে স্থির চিত্তে বসিয়া ভাবিলেন। তারপর সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া কোন্ অদৃশ্য পথে চলিলেন, কেহই জানিল না।

এই সকল ঘটনা এত অল্প সময়ে ঘটিল যে, গ্রামে পুলিসের গোলযোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হরিদাস আপন পথ ধরিলেন। কেহই হরিদাসের সংবাদ পাইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাষাণী।

কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, তার উপর আরো কলঙ্ক। কিন্তু আজ ভগ্নী স্বর্ণকলি কোমরে কাপড় বাঁধিয়াছেন। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, এই অবস্থায় ভাবী জীবনের দুঃখের চিত্র তিনি হৃদয়ে উজ্জ্বল করিয়া আঁকিয়াছেন। সোনার ভাইকে আর পাইবেন না, বুঝিয়াছেন! জননী পুত্রের শোক সহ্য করিতে পারিবেন না, সুতরাং ভ্রাতার শোকে তাঁর মৃত্যু যে নিশ্চয়, তাহাও বুঝিয়াছেন। যে এত দুঃখের কথা ভাবিতে পারে, সে কি জীবন ধারণ করিতে পারে? আশাশূন্য হইয়া কি মানুষ বাঁচিতে পারে? পারে কি না পারে, যে দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিতে বসি নাই। স্বর্ণকলি এত দুঃখের চিত্র আঁকিয়াও বাঁচিবার জন্য কোমর বাঁধিতেছেন. তিনি বুঝিয়াছেন, জীবনে অনেক কাজ বাকী আছে। এ মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে।

রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে গ্রামে হই-হই রই-রই পড়িয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে কাণাকাণী, পাড়ায় পাড়ায় লোকের দল, গলিতে গলিতে

পুলিস ;—বিষম ব্যাপার উপস্থিত। সময় পাইয়া পুলিস নানা জনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে লাগিল। টাকা যে না দিবে, তাহাকেই আসামী শ্রেণীতে প্রবেশ করাইবে, পুলিস-বাহাদুরের এই আজ্ঞা। লোকেরা ভয়ে জড়সড়, গোপনে গোপনে টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপই চলিল। কে খুণ করিয়াছে?—এ কাহার কাজ? পুলিস ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাহা অবিষ্কার করিতেছে না। যথারূপে উদরপূরণের পর পুলিস প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইবার জন্য একটু চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে চেষ্টাও মৌখিক রকমের, প্রকৃত রূপ নয়। দারোগা সাহেব একটু গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ থাকায় কোন দিন বলরামের দ্বারায় কিছু অপমানিত হইয়াছিলেন, হরিদাসের সৌভাগ্য ক্রমে, আসামী রূপে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মৃতদেহ সহ চালান দিল। মকদ্দমা চালাইবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, বলা বাহুল্য, সে সকল আয়োজন ভালরূপই হইল।

হরিদাসের প্রতি লোকের কোন সন্দেহ হইল না। হরিদাস ইদানীং প্রায়ই বাড়ীতে বা গ্রামে থাকিতেন না। এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকেরা বিরোধী, সুতরাং কেহ অনুসন্ধানও করিত না। হরিদাসের প্রতি লোকেরা যতই বিরক্ত হউক না কেন, হরিদাস মানুষ হত্যা করিতে পারে, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। হরিদাসের চরিত্রের প্রতি লোকের এতই বিশ্বাস। হরিদাসকে অনেক বিষয়েই ধর্ম্মভীত ব্যক্তি বলিয়া গ্রামের লোকেরা জানে। সুতরাং এ মকদ্দমায় হরিদাস আসামী হইল না।

হরিদাসকে বিদায় দিয়া যোগী হরিদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে গোপনে কিছু আহারের জিনিষ লইয়া চলিলেন। সোনার পুরী তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জননী নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন, স্বর্ণকলি পার্শ্বে বসিয়া মাকে কত কথা বুঝাইতেছেন। বাড়ীতে অনেকক্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছিয়াছে। স্বর্ণ সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন। জননীর দুনয়ন হইতে জল পড়িতেছে। ভগ্নী আজ পাষাণে বুক বাঁধিয়া মাকে আশ্বাস দিতেছেন। এই সময়ে যোগী গৃহেরদ্বারে আঘাত করিলেন। জননী ও কন্যা ব্যস্ত হইয়া দীপ জালিলেন এবং এই উপস্থিত বিপদের বন্ধুরূপে যোগীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। যোগীর মুখে এক অলৌকিক শোভা দীপ্তি

পাইতেছে। যোগীর বয়স খুব অধিক নয়, দেহ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল, বিস্ফারিত নয়ন, অতি মধুর মূর্ত্তি। তার উপর আজ কে যেন কোমল লেখনীতে লিখিয়া দিয়াছে—"বিপন্নের সহায়।" ভগ্নী স্বর্ণকলি আজ এই মধুর মুর্ত্তি দেখিয়াই এই কয়েকটি কথা পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন। যোগী উপবিষ্ট হইলেন। জননী ও কন্যা বিষণ্ণ মনে পৃথক আসনে একত্রে বসিলেন।

যোগী আহার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"স্বর্ণ, কিছু শুনিয়াছ কি, কিছু বুঝিয়াছ কি?

স্বর্ণকলি বলিলেন, শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

যোগী।—এমন কথা কেন বলিতেছ? তোমার দাদা মানুষ নয়, দেবতা। তোমাদের কপাল ভাঙ্গে নাই, সুপ্রসন্ন হইয়াছে।

স্বর্ণকলি।—একথা কেন বলিতেছেন?

যোগী।—না, করিয়া লইলে তোমার অকৃত্রিমতা বুঝা কঠিন। বিধাতার রাজ্যে—তাই এই পরীক্ষা। সময় আসিয়াছে, প্রস্তুত হও।

স্বর্ণকলি।—আমি প্রস্তুত, কি মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছেন না? মাকে আর রাখিতে পারিব না।

যোগী।—মা ত মা নন, উনি দেবী। উহাঁর জন্য চিন্তা কি?

স্বর্ণ।—সে কথা যা'ক, দাদা কি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন?

যোগী।—সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিশ্বাস কর, তোমার দাদাই নরহত্যা করিয়াছেন। প্রস্তুত হইয়াছ, তবে আবার মুখ মলিন কর কেন? দাদার প্রতি অভক্তি হইতেছে?

এতক্ষণ জননী স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—যোগীর সম্মুখে আত্মহারা হওয়া অন্যায়, জানেন, কিন্তু আর মনে বল বাঁধিতে পারিলেন না;—অজ্ঞাতসারে তাঁহার দুনয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার হরিদাস নর-হন্তা?

যোগী।—ধীরভাবে বলিলেন, দেবি,জননি! না,তিনি নরহন্তা হইয়াও নর-দেবতা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন, আপনি স্থির হউন, সব কথা বলিতেছি।

এইবার স্বর্ণকলি যোগীর কথার উত্তরে বলিলেন, দেব, দাদার প্রতি অভক্তি হয় নাই, হওয়া অসম্ভব। যে দিন সে অবস্থা হইবে, সে দিন আত্মহত্যা করিব। মায়ের কথা ভাবিয়াই আমি বিষণ্ণ হইয়াছি।

যোগী।—যাহা হইবার হইয়াছে, এখন কি করিবে? কি উপায় ভাবিতেছ?

স্বর্ণকলি।—উপায় হরির চরণ, তিনি যা করিবেন, তাই হইবে। সে জন্য ভাবি না। দাদা কোথায় গেলেন, কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

স্বর্ণকলির সুনয়ন হইতে এইবার অলক্ষিত ভাবে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, পুলিস বলরামকে আসামী রূপে চালান দিয়াছে। বলরাম পূর্ব্বে দুইবার খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, একবার হরিদাসের জীবন লইবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং গ্রামের লোকেরা ইহাতেই সায় দিল। পুলিসের কর্ত্তাবাবুর একটী প্রতিশোধের পথ পরিষ্কার হইল।

কথাটা শুনিয়া জননীর বুকটা যেন আনন্দে শতগুণ ফুলিয়া উঠিল। স্বর্ণকলি আরো বিষণ্ণ হইলেন;—যোগী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন।

যোগী বলিলেন, স্বর্ণ, কেমন বুঝিতেছ?

স্বর্ণকলি।—ভারি অন্যায়, পুলিস না পারে এমন কাজ নাই।

যোগী।—বলরাম অনেক অপরাধ করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে, এবার যদি শাস্তি পায়? সে ত ভালই।

স্বর্ণকলি।—এই বিষয়ে তিনি নিরপরাধী, তিনি শাস্তি পাইবেন?

যোগী। —পাইলে ভাল না মন্দ?

স্বর্ণকলি।—এমন ভালোর মুখে ছাই। ইহা অপেক্ষা আর অন্যায় কি হইতে পারে?

যোগী।—হরিদাসের প্রাণনাশ!

স্বর্ণকলি।—সে সহস্র গুণে ভাল। তবুও নিরপরাধীর শাস্তি পাওয়া ভাল নয়? আমি এমন ভ্রাতার ভগ্নী নই যে, অন্যায়ের পোষকতা করিব?

যোগী।—স্বর্ণ, একবার ভেবে দেখ, লোকেরা তোমার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়াই হরিদাস এইরূপ করিয়াছে। তোমার প্রতি তার কি গভীর ভালবাসা।

স্বর্ণ।—আমি সে সকলই জানি, কিন্তু তবুও নিরপরাধীকে দণ্ড পাইতে দেখিতে পারিব না। তাহা হইলে ইহকাল, পরকাল, দাদার কোথাও স্থান হইবে না। ইহলোকে দাদা থাকুন আর না থাকুন, দুঃখ নাই, কিন্তু দেব,

আপনি আমাদের পরম হিতৈষী, সাবধান, দাদার অন্তিমের পথে কণ্টক রোপণ করিবেন না। আমি জীবিতা থাকিতে নিশ্চয় জানিবেন, তাহা পারিবেনও না।

যোগী।—তুমি কি মনে করিয়াছ, বলরামের চালানের মধ্যে আমার কোনরূপ ইঙ্গিত আছে?

স্বর্ণকলি।—আছে, আমি মনে করি। অস্বীকার করুন ত?

যোগী।—যদি থাকে, তবে তাহা কি মন্দ? পাপীর প্রাণের বিনিময়ে দেবতাকে রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করি। তুমি কি বল?

স্বর্ণকলি।—না—তা কখনই উচিত নয়। আপনার পায়ে ধরি, এ পথ অবলম্বন করিয়া দাদার পরকালের পথে কণ্টক রোপণ করিবেন না। বলুন ত আমরা আর কতদিন থাকিব? দাদা বলিতেন, "ভগ্নি, মিথ্যা যেন কখনও তোমার দ্বারা প্রশ্রয় না পায়।" আমি কখনই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিব না।

যোগী।—তবে তুমি কি করিবে?

স্বর্ণকলি।—যাহা সত্য, তাহা প্রকাশ করিব।

যোগী।—বলরাম যে তোমাদের ভয়ানক শত্রু!

স্বর্ণকলি।—তিনি যে আমাদের শত্রু, একথা বিশ্বাস করি না। আর তিনি যদি শত্রুই হন, তাতেই বা কি? আমরা কেন শত্রুতাচরণ করিব? আর তাহা করিব, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া? না—তা কখনই হইবে না।

যোগী।—সত্য প্রকাশ হইলে তোমার দাদার ফাঁসি হইবে?

স্বর্ণকলি।—আমি দাদার মৃত্যু দেখিতেই জীবিতা আছি।

যোগী।—তিনি তোমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে তুমি এইরূপ কামনা কর?

স্বর্ণকলি।—যাহা ইচ্ছা বলুন, ধর্ম্ম ধর্ম্মই থাকুক। আশীর্ব্বাদ করুন, অধর্ম্ম মিথ্যা যেন আমার জীবনে কখনও প্রশ্রয় না পায়। দাদার ইহাই আদেশ। এই আদেশ পালন করিয়া দাদার সহিত স্বর্গে মিলিত হইব। দাদার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কথাগুলি শুনিয়া রামানন্দ তীর্থস্বামী বড়ই বিরক্ত হইলেন; সর্ব্বশরীর ভেদ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল।

জননী নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—পাষাণি, তবে চল্, আগে আমারে শ্মশানে রেখে আয়!

স্বর্ণকলির ঐরূপ নিদারুণ কথার পরই জননীর অবসন্ন শরীর আ র। অবসন্ন হইয়া পড়িল। হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বর্ণকলির মন এত কঠিন, কল্পনাও ছিল না। তার কথা যেন সর্ব্বাঙ্গকে বিলোড়িত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিন আহার করেন নাই, রাত্রেও করিলেন না। ভাবনা চিন্তায় সেই রাত্রেই তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। দারুণ জ্বরে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম বাহিরে না ভিতরে ?

তারপর দিন হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ—চতুর্দ্দিকে শুধুই মেঘ। বায়ু জোরে বয় না, মেঘ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি পড়ে না।—কিন্তু মেঘের ধারে মেঘ,—চারিদিকে কেবল মেঘের বাজার। সূর্য্য উঠে না—নক্ষত্রও উঠে না। দুর্দ্দিন ত দুর্দ্দিন। সোনাপুরের আকাশে কালমেঘ-গৃহে গৃহে অশান্তির মেঘ। পুলিসের অত্যাচার আজও সম্পূর্ণ রূপ থামে নাই। বলরাম আসামী হইয়াছে, কিন্তু সব মিথ্যা সাক্ষী এখনও সংগ্রহ নাই। জনরব এই, রামানন্দ স্বামী এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছেন।

বলরাম নিজের অবস্থা বুঝিয়াছে, সে অনুতপ্ত সে এখন দেবতা। হরিদাস তার জন্য যাহা করিয়াছে, বলরাম তাহা প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। বলরাম একগুঁয়ে, বলরাম বদমায়েস, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। এখনকার সভ্য সমাজের চস্‌মা-অক্ষি লোকের ন্যায় উপকারী বন্ধুর রক্ত শোষণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে সে জানে না। হরিদাসের জন্য সে জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, ইহাই তার গত জীবনের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। বুঝিয়াছে, কৃতজ্ঞতাতেই তার স্বর্গ, তার বৈকুণ্ঠ। এই জন্যই বলরাম পুলিসে স্বীকার করিয়াছে যে, সে নরহত্যা করিয়াছে। কিন্তু পাছে শেষে সে একথা অস্বীকার করে এই জন্য পুলিস সাক্ষীর বন্দোবস্ত করিতেছে।

বলরাম হরিদাসের জন্য ব্যস্ত, যোগীও তার জন্য অস্থির। যোগী পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সোনাপুরে বিখ্যাত, কিন্তু তিনি আজ পরোপকারের জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছেন! আর বলরাম নরপিশাচ, সে আজ উপকারীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কে বলিবে, ধর্ম্ম ভিতরে, না বাহিরের পোষাকপরিচ্ছদে?

ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলে জলে পথ ঘাট দুর্গম হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য রাস্তা সকল কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। হাটবাজার মেলে না। ৪।৫ দিন ক্রমাগত জল হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে স্বর্ণকলি দিবারাত্রি জননীর শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই ভীষণ রাত্রিতেই জননীর বিষম জ্বর হইয়াছে, সে জ্বরের আর বিরাম হয় নাই। ভগ্নীর কষ্ট ভাই হরিদাস দেখিলেন না, পাড়ার লোকেরা কেহই বাড়ীতে ঘেসে না। যাহারা ঘেসে তাহারা ভ্রূকুটী করিয়া বক্র মুখে দূর দিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের ছায়াস্পর্শ করিলেও যেন পাপস্পর্শে! পাপটা যেন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় মানুষকে গ্রাস করিবার জন্য এই গৃহে বিরাজিত রহিয়াছে! একাকিনী স্বর্ণকলি পথ্য ও ঔষধ, সেবা শুশ্রূষা, সকলই। যোগী বিপন্নের সহায়, কিন্তু তিনি মকদ্দমায় ব্যস্ত। তাঁহার মনে কি অভিসন্ধি, কে জানে? এ গৃহ রহিল কি থাকিল, পরদিন হইতে তিনি আর খোঁজ রাখিতে পারেন নাই।

৪।৫ দিন পর তিনি বিষম পীড়ার সংবাদ পাইলেন, তখন জননীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বিকারের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অতি কষ্টে তিনি কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিয়া হরিদাসের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। একটী ভৃত্য, সে খাটিয়া খাটিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জননীর উদরে এ পর্য্যন্ত আর ঔষধ পড়ে নাই। আজও তিনি ঔষধ খাইলেন না। ঔষধ লইয়া স্বর্ণ মুখের কাছে ধরিলে জননী বলিলেন, "পাষাণি, এ সংসারে আমার আর ঔষধ নাই, শ্মশানই একমাত্র ঔষধ। চল্, সেই খানে রাখিবি চল্। জল—দে, কেবল জল।"

একাকিনী জননীর এই অন্তিম অবস্থা স্বর্ণকলি দেখিতেছেন, আর চক্ষের জলে মাটী ভাসিতেছে। বুঝিতেছেন, তিনি জননীর হৃদয়ে যে আঘাত করিয়াছেন, সেই আঘাতই জননীর এই পীড়ার কারণ। কিন্তু ইহা দূর করিবার আর উপায় নাই। মিথ্যা স্তোব বাক্য বলিয়া শান্ত্বনা দিতে পারিতেছেন না,—দাদাও কাছে নাই। ব্যাধির ঔষধ আর কোথায়?

স্বর্ণকলি অনাহারে, রাত্রি জাগরণে, মনের কষ্টে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মনের বল সমভাবেই আছে। প্রার্থনা করিতেছেন আর বলিতেছেন—"হরিহে,তোমাকে যেন এই বিপদে না ভুলি।" স্বর্ণকলি আজ জননীর অবস্থা ভাল বুঝিতেছেন না। জননী আজ চিৎকার করিয়া কেবল জল জল করিতেছেন, আর যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছেন ; "হরিদাস তুই কোথায়। পাষাণী, সর্ব্বনাশিনী আমায় বিষ দিয়া মারিতেছে, তুই কোথায় ? আমার সোনার বাছা, আমি থাকতে কে তোকে মারে ? তো'কে যে পাষাণী খুন করিবে আমি আছি, ভয় নাই, কাছে আয়।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া সমস্ত দিন স্বর্ণকে জ্বালাতন করিয়াছেন। স্বর্ণ অবিচলিত, জননী যত তিরস্কার করিয়াছেন, স্বর্ণ তত কোমল হইয়া মধুর ভাবে সুশ্রুষা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, মা, দাদা আসিতেছেন, মা আমার যে আর কেহ নাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

স্নেহরূপিনী মা আজ আর মা নন্। তাঁর জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিতে যে এই অন্ধকার পুরীতে, এই বিশাল ধরায় আর কেহ নাই, মা আজ আর তাহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় নিদারুণ ভাষায় অনাথিনীকে তিরস্কার করিয়া ক্ষত দেহে বারম্বার আঘাত করিতেছেন! স্বর্ণকলি নির্জ্জন গৃহকে পূর্ণ করিয়া কেবল মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন, আর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছেন।

এই ঘোরতর অবস্থায়, সন্ধ্যার প্রাক্কালে,হরিদাস সহসা উপস্থিত হইলেন। সে সন্ধ্যা সামান্য সন্ধ্যা নয়—জীবন ডুবাইবার,মাতৃ স্নেহ-সূর্য্যকে ডুবাইবার জন্য এই ঘোর সন্ধ্যা আজ আসিয়াছে! হরিদাস নিকটেই ছিলেন, বলরাম গ্রেপ্তার হইয়াছে, ইহা তাহার প্রাণের অসহ্য ; কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক পাইতেছেন না। ইত্যবসরে জননীর পীড়ার কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন, তীর্থস্বামীর সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হয় নাই। হরিদাস, স্বর্ণের সাধের দাদা, এই কয়েক দিন পর ভগ্নী ও জননীর অবস্থা দেখিয়া আজ বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইলেন। তিনি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু মুখে কথা সরিল না।

স্বর্ণকলি জননীকে বলিলেন,—মা তোমার ঔষধ আসিয়াছে, চাহিয়া দেখ, তোমার হরিদাস তোমার কাছে।

জননী একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কিন্তু কথা বলিবার শক্তি ছিল না ; কথা বলিলেন না।

হরিদাস আর থাকিতে পারিলেন না, ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "মা আমিই তোমার প্রাণ লইবার কারণ হইলাম। মা, আমাদিগকে ফেলে কোথায় চলিলে? আমাদের যে আর কেহ নাই? মা আমরা যে অনাথ।

মা একবার মাত্র চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কথা বলিতে পারিলেন না। মুখ তখন যেন বিকৃত হইয়া যাইতেছিল, কথা মোটেই ফুটিতেছিল না।

হরিদাস ভগ্নীকে বলিলেন, বোন্, আমি তোকে কেবল কষ্ট দিতে জন্মেছি আমাকে খুন করে ফেল; তোর পায়ে পড়ি, আমি আর সহিতে পারি না।

স্বর্ণকালি স্থির ভাবে বলিলেন, "দাদা, অধীর হইও না, হরিকে স্মরণ কর, তাঁর হস্ত সকল কার্য্যে দেখ, তার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই কথা বলিতে বলিতে জননীর প্রাণ বহির্গত হইল। এ গৃহের স্নেহ দীপ-একেবারে নির্ব্বাণ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

অমাবস্যার রাত্রি,—শ্রাবণ মাস,—চতুর্দ্দিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গাছ পালা, বাড়ীঘর, নদ নদী,—সব মসীময়। নক্ষত্র মেঘের কোলে ডুবিয়াছে,—পৃথিবীর লোকের সহিত সাক্ষাৎ নাই। আকাশে অন্ধকার, পাতালে অন্ধকার—জলে স্থলে সর্ব্বত্র কেবল গাঢ় অন্ধকার। মেঘের সহিত নক্ষত্রদের যুদ্ধ চলিয়াছে—নক্ষত্রগুলি বাহির হইয়া মিটি মিটি হাসিতে চায়, পথিকদিগকে পথ দেখাইতে চায়, মেঘ রাশির তাহা সয় না, ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া ক্রমাগত নক্ষত্রগুলিকে চাপা দিয়া ঢাকিতেছে। পথে ঘাটে চলা দুষ্কর। ক্রমাগত ৭ দিন বৃষ্টি পড়িয়াছে—গ্রাম্য পথ ঘাট কর্দ্দমময়, জলময়। আজও বৃষ্টি পড়িতেছে, অবিশ্রান্ত—টুপ্ টুপ্ টুপ্। রাস্তাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাতে আবার জঙ্গল-বেষ্টিত—অতি কষ্টে পা ফেলিয়া যাওয়া যায়। পদ কর্দ্দমে ডুবিয়া গিয়াছে, কার সাধ্য সভ্যতা রক্ষা করিয়া পথে চলে। আঁধারে আঁধার

মিশিয়া গিয়াছে—কর্দ্দমে কর্দ্দম মিশিয়া গিয়াছে—জলে জল মিশিয়া একাকার। মানুষ আর ঘরের বাহির হইতে চায় না। মানুষ আর ঘরের বাহির হয় না। ঘরে বসিয়া গ্রাম্য লোকগুলি অসার হইয়া গিয়াছে। রোগীর ঔষধের জন্যও কবিরাজ ডাকিতে যাইতে চায় না। হাট বাজার বন্ধ—আহার জুটে না। আজ অষ্টম দিন—আজ অনেককে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ের কান্নাকাটি পড়িয়াছিল, তাহা এখন মিটিয়া গিয়াছে। নিদ্রা আসিয়া তাহাদের চক্ষুতে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। ভেক জাতির আজ বড়ই আনন্দ,—ক্রমাগত গলা ছাড়িয়া দলে দলে আনন্দ-গীত গাহিতেছে। সে গানের আসক্তিতে বৃষ্টি ক্রমাগত স্বর্গ হইয়া নামিতেছে। নামিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই বাদলার বাঙ্গলার পল্লিগ্রামের আজ কি দুর্দ্দিন।

এই দুর্দ্দিনে, মাথায় বৃষ্টি বহিয়া, অন্ধকারে ডুবিয়া একটি মৃতদেহ বহন করিয়া নদীর দিকে যাইতেছে— কেবল ভাই ভগিনী। সন্ধ্যার একটু পরই চির-দিনের জন্য ভাসাভাসার ডোর ছিঁড়িয়া মা পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ভাই বোন উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া উভয়ে বুক বাঁধিয়াছেন। একে অমা-বস্যার রাত্রি, তাতে বৃষ্টি কম গতই পড়িতেছে —তাতে অস্পৃশ্যা জাতনাশিনীর —শব। পাড়ার কোন লোক কাছে ঘেসে নাই। ভাই ভগিনী আশাও করিতে পারেন নাই যে, কেহ সাহায্য করিবে? ভাই ভগিনী সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কর্দ্দমাক্ত কলেবরে মাতৃশব লইয়া শ্মশানে চলিয়াছেন! সোনাপুরের লোকেরা কি মানুষ না নরকের পিশাচ?

একটী মাত্র চাকর সহায়। সে সন্ধ্যা হইতে কাঠ বহিয়া বহিয়া এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তার নিকট আর সাহায্য পাইবার আশা নাই। সে শ্মশানের প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতেছে। সম্মুখে একটী লণ্ঠনে একটী দীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। লণ্ঠনের উপর একটী ছাতি। যথাসময়ে ভাই ভগিনী শ্মশানে পৌঁছিলেন। শব শ্মশানে রাখা হইল। শ্মশানে অতি কষ্টে একটু একটু আগুন জ্বলিল। সমস্ত রাত্রি নিবু নিবু হইয়া আগুন জ্বলিল। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া ভাই ভগিনী সন্তানের শেষ কর্ত্তব্য পালন করিলেন—মাতার দেহকে শ্মশানের ভস্মে পরি-ণত করিলেন! মাতার শরীর যখন একেবারে ভস্মময় হইল—আর কিছুই রহিল না—তখন একটী পাত্রে কতকগুলি শ্মশানের ভস্ম তুলিয়া ভ্রাতা

ভগ্নী শ্মশানে জল ঢালিলেন। চিতা দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাণ হইল। আকাশের বৃষ্টি সময় বুঝিয়া এখন একটু বেগ সম্বরণ করিল।

কার্য্য যখন শেষ হইয়া যাইল—তখন ভগিনী ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা,—এত ভালবাসা, এত আশা, এত আসক্তি—সব ছাই হইল! আমাদের পরিণাম কি কেবলই ছাই?

দাদা বলিলেন—ছাইই এ জীবনে পরিণাম! কিন্তু দুঃখ কি? তোমার হরির ইচ্ছারই জয়। ইহাই এই জীবনের পরিণাম! কিন্তু দুঃখ কি বোন্! একদিন আমরাও এইরূপ ভস্মে পরিণত হইব!

ভগিনী আবার বলিলেন—"তবে মান, অভিমান কেন, তবে অহঙ্কার কেন, তবে সুখের আশা কেন?—এস না দাদা, আমরাও শ্মশানের ছাই হই। এস না দাদা, আমরাও আগুনে পুড়িয়া মরি।

দাদা বলিলেন—ইচ্ছা যতদিন, ততদিনই আসক্তি, অহঙ্কার। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যখন দ্বিত্ববোধ ডুবিবে, তখনই ভস্ম হইতে পারিবে। কিন্তু আজও সে দিনের বিলম্ব আছে। পৃথিবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এই শ্মশানে কেহ ভস্ম হইতে পারে না। ইহা হরিরই ইচ্ছা। এখন চল, মায়ের ভস্ম লইয়া গৃহে যাই।

পৃথিবীর ভালবাসার পরিণাম এই চিতাভস্ম তুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাই ভগিনী উভয়ে মিলিয়া উদাস-প্রাণে গৃহে ফিরিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সংসারের অতীত ভালবাসা।

ভাই ভগিনী মাতাকে চিরকালের জন্য শ্মশানের কোলে রাখিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহ আর গৃহ নয়। যে পুরী মাতৃশূন্য, সে পুরী শ্মশান। ভাই ভগিনী বাড়ীতে মাতাকে রাখিয়া প্রকৃত শ্মশানে আসিলেন। কিসের আসক্তিতে?—কিসের মমতায়? সোনাপুর ত শ্মশানপুর! তবে কেন গৃহে আসিলেন? কে জানে কেন?

হরিদাস গৃহে আসিয়া ভগ্নীর মন পরীক্ষার্থ বলিলেন, "বোন্, এখনও সোনাপুরে থাকিবে? এখনও দেশ ছাড়িবে না?

স্বর্ণকলি।--দাদা, দেশ ছাড়িব কেন? যেখানে বাবার জন্ম, যেখানে মায়ের ভস্ম প্রোথিত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শান্তির আলয় আর কোথায় পাইব? ছাই হউক, কিন্তু মনে রাখিও দাদা, ইহা খাঁটী জিনিসের ছাই। খাঁটী জিনিসের ভস্মও ভাল, ঝুঠা মালের আসলও ভাল নয়। এমন ভালবাসা আর কি জগতে মিলিবে? যে জিনিস বিদায় দিয়াছি, এ জগতে আর সে অমূল্য পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ মিলিবে না, তবে কিসের মমতায় ঘর ছাড়িয়া পরবাসে যাইব?—গৃহে আর কিছু না থাকুক, মায়ের স্মৃতি জাগিতেছে। আর ঐ খালের ধারের বটতলায় মায়ের যে অপরূপ ভস্ম হইতে দেখিয়াছি, আমি ঐ বটতলাকে কখনও ভুলিতে পারিব না। দাদা, আমি বুঝিয়াছি, ঐ বটতলাই আমার চির-গৃহ, চির-সম্বল, চির-আশ্রয়।

স্বর্ণকলির নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে দেখিয়া হরিদাস ভগ্নীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,--ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু আমি এখন কি করিব?

স্বর্ণকলি তখনও কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা যে পথে গিয়াছেন, তোমারও সেই পথ! আমি আর উপায় দেখিতেছি না।

হরিদাস।—তোমার উপায়?

স্বর্ণকলি।—ঐ বটতলার শ্মশান!

হরিদাসের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, বলিলেন, তুমি আমাকে হারাইয়াও থাকিতে পারিবে? কি খাইবে, কি পরিবে? কে তোমাকে রক্ষা করিবে?

স্বর্ণকলি বলিলেন, মাকে হারাইয়া যে কন্যা থাকিতে পারে, ভাইকে হারাইয়া সে ভগ্নী থাকিতে পারিবে না? তারপর আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আহার দিয়া রক্ষা করিবেন। আত্মহত্যা করিব না, কেন না, তাহা পাপ। আত্মহত্যায় আমার কোনই অধিকার নাই। আত্মই বা কাহাকে বলি? আমি ত আমার নই। আমি যাঁহার, তিনি ঐ আকাশে এবং পৃথিবীর দীন দুঃখীর হৃদয়ে। পরের আত্মা হরণ করিবার আমার অধিকার নাই। যতদিন তিনি রাখিবেন, ততদিন থাকিব।' তারপর তোমাদের সহিত আবার মিলিব।

হরিদাস।—কোথায় মিলিবে ?

স্বর্ণকলি আবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐ স্বর্গে।

হরিদাস। –তুমি আমাকে মরিতে বলিতেছ ?

স্বর্ণকলি।—আমি বলিতেছি না, কিন্তু তোমার আর উপায় নাই ; সত্যের জন্য আত্মসমর্পণ করাই তোমার এখন একমাত্র ধর্ম্মের পথ। বলরাম বাবু তোমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, কিন্তু তুমি তাহা কেমনে সহ্য করিবে ? তাঁহাকে মরিতে দিলে তোমার ধর্ম্ম বজায় থাকিবে না। একে সামান্য কারণে পাপের বোঝা কত ভারি করিয়া ফেলিয়াছ, এখন আর অন্য উপায় খুঁজিলে সেই বোঝা যে আরো ভারি হইবে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না ? সুতরাং আত্মত্যাগই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম। ভয় কি ? তুমি আমার দাদার মত কথা বলিও, অন্যরূপ কেন করিবে ?

হরিদাস স্বর্ণের সেই ভ্রূকুঞ্চিত বিশাল ললাট নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার আর বাক্য বলিতে সাহস হইতেছে না। স্বর্ণকলি ধর্ম্ম জগতের কতদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ভাবিতেও সঙ্কোচ হইতে লাগিল। হরিদাস হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

স্বর্ণকলি পুনঃ বলিতে লাগিলেন, দাদা, আমি মমতা-শূন্য লোকের ন্যায় তোমাকে বড়ই নিদারুণ কথা বলিতেছি। মা আমাকে পাষাণী বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও আমাকে পাষাণী ভাবিতেছ, পৃথিবীর লোকেরাও আমাকে পাষাণী ভাবিবে, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, সত্য ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। একথা তোমার মুখেই শুনিয়াছি। তোমার নিকটই আমার এ প্রথম শিক্ষা। আজ তুমি নীরব হইতেছ কেন ?—তোমার ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই অধীর হইতেছে। তুমি কি প্রতারণার পথ ধরিয়া এই ভয়ানক নরহত্যা অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, মনে, ভাবিতেছ ? তোমার শরীরে ক্রোধ আছে, হিংসা আছে, সুতরাং তুমি এখনও ধর্ম্মের অধিকারী হ'ও নাই। এই পাপ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য বসন পরিধান করিতে চেষ্টা কর। অনুতাপানলে এই শরীরকে ভস্ম করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে সচেষ্ট হও। আর সময় নাই, তুমি কি কাজ করিয়াছ, এখনও তোমার ধারণা হইতেছে না ? ছি দাদা, তুমি এমন হলে কেন ? দাদা কথা বল, নীরবে রহিলে কেন ?

হরিদাস তবুও কোন কথা বলিলেন না।

স্বর্ণকলি পুনঃ বলিলেন, আমি আজ তোমাকে আদর করিব, এই দারুণ মাতৃ-শোকের দিনে সান্ত্বনা দিব, না, আজ তোমাকে চিরকালের জন্য বিদায় দিতেছি। আমার কলঙ্ক দেশে দেশে রাষ্ট্র হউক। আমি আর ঠিক থাকিতে পারিতেছি না। তুমি আজই পুলিসে হাজির হও। আমার নিকট আর কোন উপদেশ পাইবে না। হায়, না জানি, বলরাম বাবু তোমার জন্য পুলিসের হাতে কত নির্যাতন, কত অপমান সহ্য করিতেছেন! দাদা, মনে ভাবিও না, তোমাকে বিদায় দিয়া আমি সুস্থ থাকিতে পারিব।" আমি আর যে অধিক দিন জীবিতা থাকিতে পারিব, সে আশা নাই। মাকে ও তোমাকে ভিন্ন আমি আর কিছু জানি না। মা গিয়াছেন, এখন তোমাকে হারাইয়া আমি যে কি হইব, তাহা জানিনা। আমার ধর্ম্ম বজায় থাকিবে কি না, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিব কি না, কিছুই জানি না। কিন্তু এ সকল এখন আর ভাবিবার সময় পাইতেছি না। আমি মায়ের শোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। আমার প্রাণে হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, যতক্ষণ তুমি না যাইবে, ততক্ষণ আমি সুস্থ হইতে পারিব না। দাদা, তোমার পায়ে ধরি, আর অনর্থা না করিয়া আজ এই প্রাতেই তুমি পুলিসে হাজির হও। যা বরাতে থাকে, তাহাই হইবে? ভাব কি? মৃত্যু ত এক দিন প্রাণ করিবেই করিবে? তুমিই ত বলিয়াছ যে, আমাদের পরিণাম—কেবল ছাই! তবে আর চিন্তা কি! বীরের ন্যায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। সত্যের জন্য যে মরিতে পারে, তার ন্যায় বীর আর কে আছে? দাদা, সত্যকে সম্বল করিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। ভয় কি, মৃত্যুর দিন আমি তোমার কাছে থাকিব।

এবার হরিদাসের বাক্য ফুটিল। হরিদাস বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট যে জীবনের জন্য জীবন গ্রহণ করেন, ইহা কি তুমি সঙ্গত মনে কর?

স্বর্ণকলি বলিলেন, না, তাহা সঙ্গত নয়। কিন্তু আইন যখন রহিয়াছে, তখন আর উপায় নাই। বিশেষতঃ বলরাম বাবু তোমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত। একথা একবার ভাবিয়া দেখ ত? দাদা, আমার সোণার দাদা, স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হও।—যেখানে মা গিয়াছেন, সে স্থানের তুল্য স্থান আর কি জগতে আছে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে বৈকুণ্ঠ মিলিবে না। এই জন্যই তোমার পা ধরিয়া বলি, দাদা প্রস্তুত হও।

স্বর্ণকলির এইরূপ উৎসাহযুক্ত কথা হরিদাসের শিরায় শিরায়, ধমনীতে

ধমনীতে অণুপ্রবিষ্ট হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। "এমন স্নেহের পাত্রী ভগ্নী, সেও মরিতে বলিতেছে।—আমাকে আজ আদর করিবে, কত যত্ন করিবে? এই শোকের দিনে ভাইকে বুকে ধরিতে চাহিবে, না অকপট চিত্তে বিদায় দিতেছে! এ ব্যবহার কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? স্বর্ণকলি নারী বেশে পিশাচী কি?"—ক্ষণকাল এই চিন্তা মনে উদিত হইল, কিন্তু বিকৃত মন অধিক ক্ষণ রহিল না, পরক্ষণেই ভাবিলেন, না—ভগিনী আমার স্বর্গের পরী, ধর্ম্ম-বাণী, আশার স্বপ্ন। ভগ্নীর কথাই শিরোধার্য্য করি। মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া হরিদাস নীরবে গাত্রোত্থান করিলেন। স্বর্ণকলিকে এই বিপদের দিনে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর অপেক্ষা করিলে ভগ্নী বড়ই কষ্ট পাইবে ভাবিয়া হরিদাস সজলনেত্রে ভগ্নীর নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—"বোন্, তবে যাই; মনে রাখিও, অপরাধী ভাইকে কখনও ভুলিও না, আমি তোমারই জন্য——" আর কথা সরিল না। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণের চক্ষের উষ্ণ ধারা সেই ধারায় মিশ্রিত হইল। উভয়ের চক্ষের জলে আজ গভীর স্নেহ মমতার নীরব কাহিনী সোনাপুরের ইতিহাসে লিখিত হইল। হরিদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন, স্বর্ণকলি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্নীকে সেই নির্জ্জন গৃহ-শ্মশানে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই বন্ধু।

হরিদাস, ভগ্নীর উত্তেজনায়, পুলিসে যাইয়া আত্ম নিবেদন করিলেন বলিলেন, বলরাম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, আমিই নর-হন্তা। পুলিস ইতিপূর্ব্বে মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করিয়া আসামী চালান দিয়াছে, সুতরাং এখন আর হরিদাসের কথায় মনোযোগ করিল না। মনোযোগ করিল না বটে, কিন্তু ভাবিল, ব্যাপারটা কি, এক বিষয়ে দুইজন আসামী হইতে চায় কেন? কেন ইহারা শাস্তি পাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত? যাহাই হউক, ইহার বিশেষ তদন্ত হইল না। হরিদাসের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে বড়ই অন্তরায় উপস্থিত হইল। ভগ্নীকে আর মুখ দেখানের যো নাই। হরিদাস এই সময়ে নানা চিন্তা মনোমধ্যে জপ করিলেন।

প্রথমত হরিদাস শ্রীনাথের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল না। সোনাপুরের নিকটেই একটী সবডিবিসন, প্রথমে সেই থানেই বলরামের বিচার হইবে। শ্রীনাথের সহিত দেখা করিয়া হরিদাস সেই রজনীর সমস্ত কথা বলিলেন। আরও বলিলেন, বলরাম নিজে আসামীতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে নির্দ্দোষী। শ্রীনাথ সবিশেষ শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। বিধাতা কাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব, কাহার মধ্যে পশুত্ব দিয়াছেন, ক্ষণ কাল ভাবিলেন এবং পরে বলিলেন—"বলরাম যদি শাস্তি পায়—তবে আর আমাদের বাঁচিয়া কাজ নাই।"

হরিদাস দেখিলেন, শ্রীনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং চক্ষু ছল ছল করিতেছে। শ্রীনাথের পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া হরিদাস অবাক হইলেন।

শ্রীনাথ পুনঃ বলিলেন, ভাই হরিদাস, তুমি সোনাপুরের যুবকমণ্ডলীর একমাত্র আদর্শ, তোমারই আদর্শে বলরাম এখন দেবতা, ভাই, দেবতার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হও।

হরিদাস বলিলেন, কি করিতে বল?—কি করিলে বলরাম রক্ষা পাইবে?

শ্রীনাথ।—তোমার এজাহার পুলিস গ্রাহ্য করে নাই; সুতরাং বলরামের পরিবর্ত্তে তোমাকে আসামী রূপে পুলিস গ্রহণ করিবে না। এখন এক উপায় এই, সংবাদ পত্রে আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করা যাউক। তাহাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তবে যে কোন প্রকারে বলরামকে লইয়া পলায়ন করিতে হইবে।

হরিদাস বলিলেন, বলরামের জন্য আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারি। বলরামের পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তি সোনাপুরে দ্বিতীয় নাই। তাঁহার নিকট জীবনে যে উপকার পাইয়াছি, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার পুত্রকে উদ্ধার করিতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কথা এই, অগ্রে বলরামের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা উচিত। বলরামের অভিপ্রায় কি, বুঝিতে পারিলে অনায়াসে একটা বিহিত হইবে। বলরামের সহিত সাক্ষাতের উপায় কি?

শ্রীনাথ বলিলেন, শুনিয়াছি, বলরাম এখন এখানেই হাজতে আছেন, আমার সহিত জেলের অনেকের সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। তোমাকে একখানি পত্র দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া জে'লার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেই তিনি বলরামের সহিত দেখা করাইয়া দিবেন।

শ্রীনাথ পত্র লিখিয়া হরিদাসের হাতে দিলে হরিদাস জে'লার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীনাথের পত্র পাইয়া জে'লার বাবু হরিদাসকে বলরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিলেন। হরিদাস দেখিলেন, ছোট একটী ঘরে বলরাম আবদ্ধ আছেন, নিকটে প্রহরী। বলরাম স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ধরা দিয়াছে বলিয়া হাতকড়ি দেওয়া হয় নাই। দেখিলেন, বলরামের উজ্জ্বল মুখ, পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। হরিদাস বলরামের সম্মুখীন হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

বলরামও প্রতি-প্রণাম করিলেন, এবং হাস্য মুখে বলিলেন, হরিদাস বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের নেতা, আমাদের গুরু, ছি, আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন কেন?

হরিদাস বুঝিলেন, বলরাম একটু বেদনা পাইয়াছে, বলিলেন, ভাবের উত্তেজনায় প্রণাম করিয়া ফেলিয়াছি, তাতে কিছু মনে করিবেন না; আমি আপনার মনে কষ্ট দিতে আসি নাই।

বলরাম বলিলেন,—তা যা'ক। আপনার শরীর কেমন? আপনার মা এবং ভগ্নী কেমন আছেন?

হরিদাস বলিলেন, আজ কদিন হইল মা পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগ্নীর উত্তেজনায় ঘরে থাকিতে না পারিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এই মুহূর্ত্তে তাহার কি দশা হইয়াছে, জানি না!

বলরাম শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল; অতি কষ্টে বলিলেন, ভগিনীকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন?—আহা, আপনাকে ছাড়িয়া এখন তিনি কি করিতেছেন, কেমনে জীবন ধারণ করিতেছেন? হায় সোনাপুরে যে সকলই তাঁহার শত্রু! আপনি তাঁহাকে ফেলিয়া আসিয়া ভাল করেন নাই।

হরিদাস বলিলেন, আপনি যা বলিতেছেন, তা সত্য, কিন্তু কি করি, ভগ্নী কিছুতেই আমাকে থাকিতে দিলেন না। আপনি আমার অপরাধের জন্য শাস্তি পাইতে, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আপনি প্রসন্ন হইলেই আমি তাহার নিকট যাইতে পারি।

বলরাম বলিলেন, কিরূপ প্রসন্ন?

হরিদাস।—আমার অপরাধের জন্য আমিই প্রাণ দিতে চাই। আপনি আপনার কথা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রত্যাহার করুন।

বলরাম বলিল, দেব, আমার নিকট এ অনুরোধ করিবেন না। আমি আপনার চরণে বড় অপরাধী—আর সেই দেবীর চরণে অনন্ত কালের জন্য অপরাধী। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করিব। আপনি দেবতা, আমার নিকট এ অনুরোধ করিবেন না।

হরিদাস বলিলেন, আপনি অপরাধী? ছি, এমন কথাও মুখে আনিবেন না। আমি নর-হন্তা—আপনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কাহার চরণে আপনি অপরাধী?

বলরাম।—আমি পাষণ্ড বটে, কিন্তু এত মূর্খ নই যে আমার পাপ আমি জানি না। আমিই সেই নিরপরাধিনী ভগ্নীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া বাল্য-সৌহৃদ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছি, মানুষকে বিশ্বাস করিতে নাই! আমিই সমাজে গোল বাধাইয়া আপনাকে নর-হন্তা রূপে সাজাইয়াছি! আর আমিই পরম পূজ্যা মাতার প্রাণ বিয়োগের কারণ,

আপনাদের সোনার সংসার ছারখার করিবার মূল! আমি মূলে না থাকিলে পরিবার বিচ্ছিন্ন হইত না, আপনি নরহত্যা করিতেন না, ভগিনীর চরিত্রের কলঙ্ক রটিত না, জননী অসময়ে পলায়ন করিতেন না। আমি এ সমস্তের মূল, আমার এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! এ জীবন পরিত্যাগই আমার এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

বলরামের দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল।

হরিদাস বলিলেন, এ সকল আপনার দোষ নয়—সময়ের ফের,—বিধাতার প্রতিলিপি। আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন। নচেৎ আমি চির-কালের জন্য ভগিনীর নয়নের বিষ হইব।

বলরাম।—তিনি দেবী, তিনি কথনও আপনার অপরাধ গণনা করিবেন না। তিনি আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। আপনার কোন ভয় নাই। তিনি নিশ্চয় আপনাকে ক্ষমা করিবেন।

হরিদাস বুঝিলেন, কিছুতেই বলরাম ফিরিবে না। তবুও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার পাপের জন্য আপনি জীবন দিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না? কেন আমার পরিণাম নষ্ট করেন?

বলরাম।—পাপ আপনাতে স্পর্শে নাই, কারণ আপনি পাপের কারণ নহেন। আমিই ঘটনার মূল কারণ, সুতরাং আমিই অপরাধী। একথার বিচার যে সে ব্যক্তি করিতে পারে; যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন। আপনি কদাচ পাপী নহেন, আপনি দেবতা! আবার দেখুন, আমি জীবন দিলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনার অভাবে সেই মাতৃহীনার সকল দিক আঁধার হইবে। জানি না, এতক্ষণ তিনি কি করিতেছেন! আপনি তাঁহার নিকট যান।

হরিদাস।—এইরূপ অবস্থায় ভগিনীর নিকট কথনই যাইতে পারিব না। আপনার পিতা আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু, আপনার অভাবে তাঁর গৃহ যে একবারে আঁধার হইবে! হায়, কিরূপে আমি তাঁর সর্ব্বনাশের কারণ হইব?

বলরাম।—আমি পিতার কুপুত্র। পিতা পরম ধার্ম্মিক, পরম দয়ালু ব্যক্তি। আমি কুকার্য্যের দ্বারা তাঁর পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপিয়াছি; যথেষ্ট হইয়াছে, আর না। আপনার পায়ে ধরি, আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

হরিদাস বলিলেন, আর অধিক কথা বলিব না। আর একটী কথা মাত্র

বলিতেছি। নিশ্চয় জানিবেন, আমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। আমার কথা শুনুন, নচেৎ অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আসুন আমরা উভয়েই পলায়ন করি।

বলরাম বলিলেন, আপনি কি সর্ব্বনেশে কথা বলেন! পলায়ন করাও কি সম্ভব? আমি যদি না যাই, তবে আপনি কি করিবেন?

হরিদাস।—আমি সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন তুলিব। আপনার পিতাকে সংবাদ দিয়া বাড়ীতে আনিয়া মকদ্দমার তদ্বির করিব। নিশ্চয় জানিবেন, আপনার পরিবর্ত্তে আমারই জীবন যাইবে।

বলরাম একটু স্তম্ভিত হইলেন, হরিদাসের কথা নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হইল না। হরিদাস যাহা বলিবে, তাহা যে নিশ্চয় করিবে, এ ধারণা তাঁহার খুব ছিল। বলরাম হরিদাসকে বাঁচাইবার জন্য এতদূর করিয়াছেন, এখন বুঝিলেন, হরিদাস গোল বাধাইলে তাঁর বিনাশের সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং অগত্যা হরিদাসের প্রস্তাবেই সম্মতি দিলেন। এ প্রস্তাব অসঙ্গত, উভয়ই জানেন। কিন্তু একের বিনাশ, অপরের অসহ্য, সুতরাং উভয়ের জীবনই রক্ষা করা উচিত, ধার্য্য হইল। পলায়নের প্রস্তাব ধার্য্য হইলে, হরিদাস শ্রীনাথের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বল প্রয়োগে।

বাল্যকাল হইতে বলরাম দুর্দ্দান্ত। বলরামের শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণ করেন। বলরাম পিসিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত। শৈশবে মাতৃহীন হইলে সন্তান বড় একটা মাতৃ স্বভাব পায় না। পিতা ধার্ম্মিক, কিন্তু তাঁর স্বভাবও বলরাম পায় নাই, কেননা তিনি বরাবর বিদেশেই থাকেন। বাল্যকাল হইতে বলরাম বন্ধনহীন অশ্বের ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার করিয়া আপন খামখেয়াল চরিতার্থ করিয়াছেন। পিতার অপার ঐশ্বর্য্য, পিসিমাতার আদরের ধন, যখন যা মনে করিয়াছেন, তখন তাহাই করিয়াছেন। বলরাম কখনও কাহারও বাধা মানেন নাই।

প্রাণ-বিয়োগ হউক তবুও ইচ্ছা চরিতার্থ না হইলে তিনি ক্ষান্ত হন না। এইরূপে অনেক ভাল কাজও করিয়াছেন, অনেক সময় অনেক মন্দ কাজও করিয়াছেন। প্রথমে কেহ কেহ বাধা দিত, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। এখন লোকের ধারণা জন্মিয়াছে, সহস্র লোক প্রতিকূলে দাঁড়াইলেও বলরাম টলিবার নহেন। বলরামের দৌরাত্ম্যে সোনাপুরের সকলে সদা অস্থির ছিল। শুভক্ষণে বলরাম পুলিসে নরহন্তা রূপে এজাহার দিয়াছেন, দলের লোক হইলেও সোনাপুরের লোকের ইহাতে আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। পিসিমাতার অঞ্চলের ধন এবার বুঝি যায়, সুতরাং পিসিমাতা দিবানিশি কাঁদিতেছেন। কিন্তু কে বলরামের বিরুদ্ধে কথা বলিবে? বিরুদ্ধে কথা বলিলে পাছে সে আত্মহত্যা করে, এজন্য কেহ কিছু বলে নাই। যাহারা বিপক্ষ, তাহারা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বিশ্বনাথরায় ৮।১০ দিনের পথ দূরে থাকেন, সুতরাং তিনিও সংবাদ পান নাই। বলরামের কপাল বুঝি তবে এবার পোড়ে!! পিসিমাতা তাই দিবারাত্রি কাঁদিতেছেন!

হরিদাসের পরামর্শে বলরামের মতি ফিরিল—পিসিমাতার অঞ্চলের নিধি তবে বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পায়। বলরামের দুর্দ্দম্য সাহস, দুর্জ্জয় তেজ, অসীম বলবিক্রম। ইচ্ছা করিয়া বদ্ধ না থাকিলে পল্লিগ্রামের হাজত, সবডিভিসনের সেকালের বংশনির্ম্মিত গারদ বলরামকে রক্ষা করিতে পারে, এমন অবস্থা ছিল না। পূর্ব্বে অনেক সবডিভিসনের গারদ বংশনির্ম্মিত ছিল। বলরামের মতি ফিরিয়াছে, হাজতের কি সাধ্য এই সিংহ-শিশুকে আবদ্ধ করিয়া রাখে?

সেইদিন রাত্রেই জেলে বড় ভয়ানক বিপদ ঘটিল। টাকার দ্বারা প্রহরীদিগকে বশ করিয়া পলায়ন করিতে বলরামের প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রহরীদিগকে অর্থ প্রলোভনে ফেলিয়া বধ করিলে কি হইবে, ইহা ভাবিয়া বলরাম বীরের বেশ ধরিয়াছেন। সে মূর্ত্তি ভীষণ। সে সাহস ভাষায় ব্যক্ত হয় না।

রাত্রে স্ফুট জ্যোৎস্না—আকাশ পরিষ্কার—চতুর্দ্দিকে ধব ধবে আলো। নীরব নিস্তব্ধ নিশি—গাছ পালা সব নীরবে ঐ স্ফুট জ্যোৎস্নায় স্নাত কলেবরে বিশ্ব-সঙ্গীত গাইতেছে। কোথাও দুই একটী কুকুর, কোথাও দুই একটী পাখী দুই একবার ডাকিতেছে। জনপ্রাণী গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। এমন সময়ে সিংহশিশু জাগরিত হইয়া প্রহরীকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দরজা খোল।"

প্রহরী অবিশ্বাস করিল না। অবিশ্বাস করিবার সময়ও পাইল না। সে আদেশ পালন না করিতেও সাহস হইল না। সে ভয়ে অথবা অসতর্ক ভাবে, অথবা বিপদের আশঙ্কা নাই মনে ভাবিয়া দরজা খুলিল। দরজা খুলিবা মাত্র বলরাম বাহিরে আসিয়া নিমেষের মধ্যে প্রহরীর বন্দুক কাড়িয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—"দূরে যা, নচেৎ এখনই তোর মাথা ভাঙ্গিব।" প্রহরী বেগতিক দেখিয়া বিকট চিৎকার করিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলরামের আঘাতে সে মৃত্তিকাশায়ী হইল। বলরাম বন্দুকের আঘাতে প্রহরীকে ভূতলশায়ী করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিলেন। প্রহরীর এক চীৎকারে সকল লোক জাগিল না। কিন্তু জেলের দ্বারে যে প্রহরী ছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া আবার চিৎকার করিল এবং বলরামকে ধরিতে ধাবিত হইল। বলরাম কথা না বলিয়া তাহার মস্তকেও পূর্ব্ববৎ আঘাত করিলেন। এবং অন্যান্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই বংশ-নির্ম্মিত প্রাচীরে উঠিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া জেলের বাহিরে পড়িলেন। বন্দুকটী সেখানে ফেলিয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

জেলে হই-চই পড়িল। পুলিসের কর্ত্তা বাবুদের ঘুম ভাঙ্গিল। ডেপুটী বাবুর সুখের নিশিতে বজ্রাঘাত হইল। চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। বনে জঙ্গলে লোক দৌড়িল। কিন্তু জেল-মুক্ত বলরামের ধারে যাইতে পারে, এখন সাহস কাহার? সবডিভিসনে কোন সাহেব ছিল না। ডেপুটী বাবুর সাহসে কুলাইল না, বুদ্ধিতেও না। পুলিস বাবুরা টাকার আশা নাই যাহাতে, তাঁহাতে গা ঢালিবেন কেন? জে'লার বাবুর মস্তকে সকল দোষ চাপাইয়া সকলে নিরস্ত হইল। তারপর দিন হইতে লেখা-লেখির বাজারটা খুব গরম হইয়া উঠিল। কাগজ কলমে আগুন বাহির হইতে লাগিল। শ্রীনাথের উপর একটু দোষ পড়িল বটে, কিন্তু চতুর শ্রীনাথ সে দোষ সামলাইয়া লইলেন। হরিদাস অদৃশ্য হওয়ায় তাহার প্রতিও লোকের গাঢ় সন্দেহ হইল। বলরাম ও হরিদাস উভয়ের নামই ছাপার কাগজে উঠিল। থানায় থানায় ইহাদের বিবরণ ছাপার কাগজে ঝুলিতে লাগিল। যে ধরিতে পারিবে, সে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবে, এরূপ বিজ্ঞাপন ঘোষিত হইল। কিন্তু সাধারণ বিভাগ, ডিটেকটিভ বিভাগ, সকল বিভাগের চক্ষু স্থির; পুলিসের কোন বিভাগই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। বাঙ্গালার পুলিসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য বিভাগ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাদের প্রধান কাজ,

ঘুষ খাওয়া, পরদ্রব্য লুণ্ঠন করা এবং ব্যভিচার করা। অপরাধী জীবন্ত লোক হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ইহাদের সাধ্য নাই। কথা এই, তবে বিচার গৃহে এত আসামী শাস্তি পায় কেন? উত্তর এই, কত নির্দ্দোষী ব্যক্তি এদেশে শাস্তি পাইয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে? বাঙ্গলার পুলিসের দ্বিতীয় কার্য্য, নির্দ্দোষীর দোষ সাব্যস্ত করা, নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া। বাঙ্গলার পুলিস বিভাগ ইংরাজ রাজত্বের বিষম কলঙ্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রত গ্রহণ।

সোনাপুরে খুব জঙ্গল ;—সোনাপুরের ধারেই নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষশ্রেণী এমন ঠেসাঠেসি ঘেষাঘেষি হইয়া রহিয়াছে যে, দিবা দুই প্রহরেও তাহাতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না। সেই নিবিড় অরণ্যে বন্য বরাহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিচরণ করে। বন্য জন্তুর ভয়ে এই সূচিভেদ্য জঙ্গলে কদাপি লোক প্রবেশ করে। এই প্রহরব্যাপী জঙ্গলের মধ্যে আজ বলরামের সহিত হরিদাস মিলিত হইয়াছেন। উভয়ের সহিত মিলনে আজ উভয়ের আনন্দ। কত দিনের হারাণ রত্ন যেন আজ মিলিয়াছে। দারুণ চিন্তার বোঝা মস্তকে, কিন্তু তবুও আজ ইহারা প্রসন্ন। কেন না, একে অপরের সহায় ; অথবা উভয়েই এক অবস্থাপন্ন। দুই বন্ধু প্রসন্নচিত্তে বহুদিনের পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। অনেক বাদলার পর রৌদ্র যেমন মিষ্ট, অনেক তিক্তের পর মধুর রস যেমন রসাল, অনেক দুঃখের পর সুখ যেমন সুখের বোধ হয়, উভয়ের মিলন, বহু বিচ্ছেদ পর, বহু শত্রুতার পর উভয়ের মিলন আজ তেমনই মধুর বোধ হইল। উভয়েই যেন প্রাণ ভরিয়া বলিলেন,—"ভাল-বাসা, তুই বেঁচে থাক, জন্মে জন্মে যেন দুঃখ বিপদে তোকে পাই।"

উভয়ে ক্ষণকাল বিচ্ছেদের ইতিহাস পরস্পর শ্রবণ করিলেন। কীট যেমন সুমিষ্ট আম্র ফলকে বিনাশ করে, সংসারেও সেই রূপ ভালবাসার প্রাণ-নাশক এক প্রকার কীট আছে, উভয়ই স্বীকার করিলেন। যাহারা মানুষের উন্নতি সহিতে পারে না, তাহারাই এই কীট বিশেষ। ইহারাই

একের কথা অপরকে অন্যরূপ বুঝাইয়া পরস্পরের মন ভাঙ্গিয়া দেয়। আজ দুই বন্ধু পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শেষে মোটামুটী উভয়েই বুঝিলেন যে, অন্যের কথা না শুনিলে তাহাদিগকে এতদিন বিচ্ছেদে মজিতে হইত না, অথবা পরস্পরের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। উভয়ে মিলিয়া নিন্দুকশ্রেণীর যথেষ্ট আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন এবং উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আর কখনও অন্যের কথায় ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হইব না। উভয়েই স্বীকার করিলেন,—"বাল্যকালে যেরূপ প্রেম গজায়, আর কোন কালে তেমন হয় না।" "ছেলে বেলার মতটি যে আর মিলে না"—উভয়ে স্বীকার করিলেন। উভয়ের নিকট উভয়ে ক্ষমা চাহিলেন। উভয়ে আবার প্রেম-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

বলরাম, হরিদাস ও শ্রীনাথ—তিন জন বাল্যবন্ধু। জীবনের প্রভাত কালে তিনে এক, অথবা একে তিন ছিল। বলরাম শারীরিক বলের অবতার, হরিদাস হৃদয়শক্তির এবং শ্রীনাথ বুদ্ধি বা প্রতিভার। তিনে এমন ভাব ছিল যে, একজনকে ডাকিলে তিন জন হাজির হইত। একত্রে আহার, একত্রে বিহার, একত্রে খেলা, একত্রে সব চলিত। হরিদাস সংসার-দুর্দৈবে অথবা অদৃষ্টের ফেরে যখন বিশ্বনাথ রায়ের সহিত বিদেশে যান, তখন হইতে এই মিলন একটু একটু ফাঁক হইতে আরম্ভ হয়। লোকে বলে, বাল্যকালের ভালবাসা—ধূলিমাটীর খেলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, যেন পদ্ম-পত্রের জল;—এই আছে, এই নাই। ঘটনা এরূপ হইল যে, এই "একে তিন, তিনে এক"—বাল্য সহচরদিগের জীবনে এ কথাটা প্রমাণীকৃত হইল। সামাজিক গোলযোগের সময় এই ভাবটা আরও জমাট বাঁধিল। যাহারা খুব আত্মীয় ছিল, তাহারাই ঘোর শত্রু হইল। হরিদাস প্রেমের অবতার—হরিদাস খুব অনিষ্ট না করিলেও, বলরাম ও শ্রীনাথ হরিদাসের বিরুদ্ধে না করিয়াছে, এমন আন্দোলন ও এমন জঘন্য কাজ নাই! পূর্ব্বে একজনের বিরুদ্ধে কেহ চলিলে, তিন জন তাহার বিরুদ্ধে লাগিত। সময়ে এমন হইল যে, হরিদাসের বিরুদ্ধে প্রবল সমাজ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকের উত্তেজনায় বলরাম ও শ্রীনাথও প্রধান শত্রু হইল। শ্রীনাথ আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, সে এখন এ সম্বন্ধে নবজীবন পাইয়াছে। বলরাম এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! বলরাম ও শ্রীনাথ উভয়ই বুঝিয়াছে যে, 'দেবতার ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র হরিদাসের বিরুদ্ধে চলিয়া ভাল কাজ করি নাই।

সমাজের আন্দোলন চিরকাল থাকিবে না, চিরকাল থাকিবার নয়—কিন্তু পৃথিবীর অতি দুর্লভ,—অবিনশ্বর ভালবাসা ধনে বঞ্চিত হই কেন?—কেন হিতৈষীর বুকে ছুরি মারি, কেন আপন দেহের রক্ত আপনারা পান করি। বিধাতার কৃপায়, ঘটনার ফেরে ইহারা এখন এই কথা বুঝিতে পারিয়াছে। সোনা এখন পরীক্ষায় পুড়িয়া আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিন এখন আবার এক হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। বিধাতার লীলাপূর্ণ অপরিহার্য্য ঘটনার প্রতিকূলে দাঁড়ায় এমন শক্তি কাহার?

এবার এ মিলনের গতি যেন কেমন এক আশ্চর্য্য পথ ধরিল। ঘটনা মানুষকে দেবতা করে, ঘটনা মানুষকে পশুত্বে লইয়া যায়। ঘটনা এবার সোনাপুরের উন্নতির মূল শক্তিকে যেন কেমন এক বিকৃত পথে লইয়া চলিল। ইহার জন্য দাবী কে? সমাজ?—না, দেশের রাজা?

ঘটনা এইরূপ হইল। শ্রীনাথ কিয়দ্দিবস পর খালাস হইলেন। তিনি আর বাড়ীতে গেলেন না। বলরাম ও হরিদাসের সহিত অরণ্যের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইলেন। তিনের মিলনে এক নব বল সৃজিত হইল। বাল্য প্রেমের নবাঙ্কুর উদ্ভূত হইল।

ভদ্র সমাজে বাহির হওয়ার উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে পুলিসের চেষ্টায় রাষ্ট্র হইয়াছে যে, দুই জন বদমায়েস পলায়ন করিয়াছে। সোনাপুরের চতুর্দ্দিকে কাণাকাণি চলিতেছিল। ক্রমে ক্রমে সেই কথা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। কোথায় যাইব, কি করিব, প্রথমে ইহারা তিন জনে ভাবিল। সমাজে যাইয়া সমাজ সংস্কার করিবার উপায় নাই, পুলিস গ্রেপ্তার করিবে, বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ নাই, পাছে গ্রেপ্তার হন্!! সকল উপায় এখন নিরুপায়ের মধ্যে পরিণত হইল! ঠিক হইল, ছদ্মবেশ ধারণ ভিন্ন আর উপায় নাই!

ইহারা অরণ্য এবং সেই সঙ্গে সোনাপুরের আশা পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময়ে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় সকলে আবদ্ধ হইলেন।

১। জীবন থাকিতে একে অপরের অনিষ্ট করিব না।

২। যে কোন প্রকারে হউক, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে, বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিতে, অনাথা বিধাতার চক্ষের জল মুছাইতে শরীরপাত করিব।

৩। সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, চরিত্রোন্নতি, ও জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ ভিন্ন জাতিত্ব গঠনের সম্ভাবনা নাই। যে কোন প্রকারে হউক, ইহার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিব।

৪। ইংরেজ জাতির পদলেহন বা মুখাপেক্ষা না করিয়া যাহাতে এ দেশের নরনারী স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিব।

৫। সর্ব্বোপরি বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া, এই জাতি ভবিষ্যতে যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণ করিব।

৬। এই সকল কার্য্য সাধনের পক্ষে যত অন্তরায় আছে,—অহঙ্কার, আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, দারিদ্র্য, লোক-লজ্জা, লোক-ঘৃণা, নির্যাতন, কারাবাস, সমস্তকে তুচ্ছ করিব; এবং জীবন থাকিতে কোন না কোন লোককে প্রত্যহ আমাদের এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিব,—"উপরে ঈশ্বর পিতা, নিম্নে মানব সাধারণ ভ্রাতা;—শিক্ষাবিস্তার, চরিত্রোন্নতি মানবের সাধনা।" এই প্রতিজ্ঞায় প্রথমে তিন জন বন্ধু স্বাক্ষর করিলেন। হরিদাসের হৃদয়ের মধুর ভাবে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। বিধাতার নামে দুঃখীর দল দারিদ্র্যকে জীবনের সম্বল করিয়া সেই নিভৃত অরণ্য পরিত্যাগ করিলেন। ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে !!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের চরমসীমায় !!

দুঃখীর বাসনা কি কখনও পরিপূর্ণ হয়? যাহারা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা কি জগতের কোন উপকারের প্রত্যাশা আছে? পৃথিবীর ধনী, পণ্ডিত ও জ্ঞানীরা যাহাদিগকে ইতর পশুর ন্যায় জ্ঞান করে, তাহাদের দ্বারা কি সংসারের কোন উন্নতির আশা আছে? ধার্ম্মিকেরা বলেন যে, "বিধাতার রাজ্যে—বড় ছোট, ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন আছে;—সকলেরই জন্মের উদ্দেশ্য আছে, সকলেরই জীবনের লক্ষ্য আছে।" কিন্তু এ সম্বন্ধে পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে? কে তাহা পাঠ করিয়াছে!!

দুঃখীর দল গুরুতর ব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনেরই বেশ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তাঁহারা তিন জনেই গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন, হাতে কমণ্ডলু, ভিক্ষার ঝুলি এবং কণ্ঠে হরির নাম ভূষণ করিয়া লইলেন।

হরিদাসের কমনীয় কান্তি দেখিলে ও মধুর কণ্ঠ, কোমল প্রকৃতির পরিচয় পাইলে কে তাহাকে অনাদর করিতে পারে? কিন্তু সে সময়ের বিধান কিছু স্বতন্ত্র ছিল। চুরি ডাকাতির ভয়ে গৃহস্থেরা বাড়ীতে কাহাকেও স্থান দিত না। নূতন লোক দেখিলেই পুলিস পশ্চাতে লাগিত। ভিক্ষুকদের মধ্যে হরিদাসকে এজন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল।

তিন জনকে এক সঙ্গে দেখিলেই পুলিসের মনে কেমন একরূপ সন্দেহ হইত। পুলিস এই কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিল, তিনজন লোক একত্র উপস্থিত হইলে স্থান দিবে না। সুতরাং দীর্ঘকাল তিন জনের এক সঙ্গে থাকা হইল না। পুলিসের মনের ভাব বুঝিয়া ইহাঁরা তিন জন পৃথক হইলেন। তিন বৎসর পর ফাল্গুন-পূর্ণিমায় পুরীর সাগরতীরে সকলে মিলিত হইবেন, ইহা ধার্য্য করিয়া ছদ্মবেশে তিন জন বিভিন্ন পথ ধরিলেন।

হরিদাস এখন একা। এত দিন তিন জন একসঙ্গে ছিলেন, সদানন্দে দিন গিয়াছে;—দুঃখ দারিদ্র্য কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে নাই। এখন একাকী পথে চলেন, আর ভগ্নীর কথা প্রাণে জাগে! স্বর্ণকলি কেমনে দিন কাটাইতেছে? কে খাইতে দিতেছে? কে তার সহায়? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বড়ই অস্থির হইলেন। আর সেই প্রসন্ন মুখের শ্রী নাই, আর সেই কণ্ঠের মধুর স্বর নাই। সোনাপুরে ফিরিয়া এই কলঙ্কিত মুখ ভগ্নীকে দেখাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না! ভাবিতেছেন, ভগ্নী কি আমাকে ক্ষমা করিবে? না—কখনই না। এই কথা দিবারাত্রি মনকে দগ্ধ করিতেছে। হরিদাস এখন কেমন একরূপ হইতেছেন!

হরিদাসকে দেখিলেই লোকের মনে সন্দেহ হইত। সুতরাং হরিদাস সকলের বাড়ীতে স্থান পাইতেন না। বস্ত্রাদি মলিন হইয়া গিয়াছে, মস্তকের কেশ, মুখের শ্মশ্রু, তৈল অভাবে এবং অঙ্গুলির নখ বৃদ্ধি হওয়ায়, কেমন এক বিকৃত রূপ হইয়াছে; পূর্ব্বে ভাল গান গাইতে পারিতেন, সে শক্তিও লোপ পাইয়াছে। ভিক্ষায় যাহা পান, তাহাও দরিদ্র দেখিলে না দিয়া পারেন না, সুতরাং সকল দিন আহার হয় না। অনাহার ও দুশ্চিন্তায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। এই পশুসম মানুষকে আদর করিয়া গৃহে তুলিবে, এমন লোক কে আছে? দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তাকায়, এমন লোক এ পৃথিবীতে কোথায় মিলে? হরিদাস বন্ধুশূন্য পৃথিবী-মরুতে ক্রমে শুষ্ক হইতে লাগিলেন। হরিদাস আপন কষ্ট বুঝিলেন। হরিদাসের হৃদয়টা খোলা,—ধারণা ছিল, আত্মীয়

বন্ধুদের বাটীতে এই বিপদের সময় গেলে স্থান হইলেও হইতে পারে। সে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তার ফল ভাল হইল না। দুই চারিজন কুটুম্বের বাড়ী সেই বেশে উপস্থিত হইলে তাহারা লাঞ্ছনার একশেষ করিল। সাহায্য করা দূরে থাকুক, পুলিসের ভয়েই হউক, বা অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক, সকলেই বাড়ী হইতে "দূর হ দূর হ" বলিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিল।" হা! বিধাত, পৃথিবীতে কি প্রকৃত বিপন্নের আশ্রয় তুমি রাখ নাই, হরিদাস অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া এই কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু তবুও দশ দুয়ারে, হরির নামের গুণে, লাঞ্ছনার পরও, যাহা মিলিত, তাহাও দুঃখী দেখিলেই দান করিতেন। সকল সময়ে কিন্তু তাহাতেও মনের ক্ষোভ মিটে নাই। হরিদাস এখন মানুষমাত্র দেখিলেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। অস্পৃশ্য কাঙ্গাল দেখিলেই আলিঙ্গন করেন। এইরূপ দারুণ কষ্টে পড়িয়াও হরিদাস বাঁচিয়া রহিয়াছেন। বিধাতার লীলা, নচেৎ দুঃখকষ্ট কে সহিবে?

লোকের স্বভাব দেখিয়া দেখিয়া হরিদাস ধনীর প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন—আর তাহাদের দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছা নাই। "পৃথিবীর সমস্ত টাকা রাশিকৃত করিয়া বাবুরা বিলাসের সেবায় মত্ত, এদিকে দ্বারে কাঙ্গাল দরিদ্র কাঁদিয়া, চিৎকার করিয়া অস্থির! কিন্তু কে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করে? কে একটু কৃপা কটাক্ষপাত করে? কে প্রসন্নমুখে অন্তত একটি মিষ্ট কথা বলে? তোমার রাজা রাজড়ার কথা জলে ভাসাইয়া দেও, "কেন তোষামোদ লইয়া ফিরিতেছ!"—হরিদাস যাহাকে পান, কেবল এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য বলেন। কথা উপলক্ষে একদিন একজন লোক বলিল, "কেন মশায়, অমুক লোক দুঃখীর জন্য কি না করিতেছেন! আপনি সেখানে কি কখনও গিয়াছেন?

হরিদাস বলিলেন—অনেক স্থান ঘুরিয়াছি, অনেক লোক দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখীর বন্ধু পাই নাই। যাঁহারা পতিতপাবন নাম ধরিয়া দেশ ও সমাজ উদ্ধারের জন্য ফিরিতেছেন, তাঁহারা দুঃখী দরিদ্রের পরম শত্রু। দরিদ্রের মস্তকে পদ প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহারা যশের মন্দিরে প্রবেশ করিতে লালায়িত! মহাশয়, আর বলিবেন না, ঢের দেখেছি।

পথিক তবুও বলিলেন—একবার যাইয়া দেখুন, তার পর কথা বলিবেন। আপনাকে দেখিলে সেই মহাত্মা কাঁদিয়াই আকুল হইবেন।

হরিদাস।—এমন লোক এদেশে আছে? আমার আত্মীয় কুটুম্ব সব

দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও ঠাঁই পাই নাই। আপন সহোদরাও ঘৃণা করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে!

এই কথাটী বলিবার সময় হরিদাসের রসনা একটু সঙ্কুচিত হইল, একটু জড়তা বোধ হইল;—প্রাণে একটু আঘাত লাগিল। কথা উল্টাইয়া বলিলেন—ভগ্নী ভিন্ন আর সকলেই দূর করিয়া দিয়াছে—দরিদ্রের সহায় মানুষ নাই।

পথিক বলিল, না মশায়, আপনি কেবল জগতের এক অংশ দেখিয়াছেন, আর এক অংশ আছে।

হরিদাস।—নর-হন্তাকে আশ্রয় দেয়, এমন লোকও জগতে আছে? ব্যভিচারীকে কোল দেয়, এমন লোকও মিলে?

পথিক কথা শুনিয়া একটু শিহরিয়া উঠিল, বলিল, আছে। কিন্তু সে কথা কেন? আপনার নাম কি মশায়?

হরিদাস অম্লান চিত্তে বলিলেন—"আমার নাম হরিদাস, নিবাস সোনাপুর।"

পথিক ক্ষণকাল একদৃষ্টে হরিদাসের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্ষণকাল পর বলিল, আপনাকে চিনিয়াছি, আপনাদের বাড়ীর কথাই বলিব মনে করিয়াছিলাম, আমি অনেক দিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপনাদের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিলাম। আপনার আজ এই দশা উপস্থিত হইয়াছে!! আসুন, আমিই আপনাকে আশ্রয় দিব।

হরিদাস বলিলেন—আমি সোনাপুরের নর-হন্তা হরিদাস, বুঝিতেছেন না? আমার নামে পুলিসের ওয়ারেণ্ট আছে, আমাকে আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন?

পথিক তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না, বলিলেন, বুঝিয়াছি, চিনিয়াছি, আপনাকে আশ্রয় দিবার জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি। আমার সহিত নির্ভয়ে আসুন।

হরিদাস অগত্যা ধীরে ধীরে তাঁহার সহিত চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুঃখী পরিবার।

হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পথিক আপন গৃহে পৌছিলেন। বাড়ীতে কেবল দুখানি ঘর। এক খানিতে রন্ধন হয়, এক খানিতে শয়ন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং একটি মেয়ে। ঘর দুখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হরিদাস বুঝিলেন না, পথিক কে?

শয়ন ঘরে হরিদাসকে বসাইয়া পথিক রন্ধন গৃহে যাইয়া স্ত্রীর নিকট সকল কথা বলিলেন। উপকারী বন্ধু আজ বিপন্ন শুনিয়া স্ত্রীর চক্ষে জল পড়িল! তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাতে সরকারী কাজের অবহেলা হইবে, এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রী অতিথিকে পর দিন বিদায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, পথিকের মন সে কথায় কিন্তু তত সায় দিল না।

রাত্রে যত্নের ত্রুটী হইল না; হরিদাস দীর্ঘকাল পর পেট ভরিয়া আজ আহার করিলেন। আহারের সময় কথায় কথায় হরিদাস শুনিলেন, গৃহী পুলিসের হেড্ কনেষ্টবল।

কথায় কথায় হরিদাস বলিলেন, আপনি পুলিসের লোক, তবে আমাকে কেমনে আশ্রয় দিবেন? আমি আর এখানে থাকিব না।

পথিক হরিদাসের মনের ভাব বুঝিবার জন্য বলিলেন, পুলিসে ধরা দিতে আপনার আপত্তি কি? আমি ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইব এবং প্রমোসনেরও সম্ভাবনা আছে। লোকেরা দরিদ্রের উপকার করে না বলিয়া আপনি আক্ষেপ করিতেছিলেন;—আপনি এ দরিদ্রের উপকার করিয়া মহত্বের পরিচয় দিন্ না কেন?

হরিদাস বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িলেন, উত্তর করিতে একটু বিলম্ব হইল। পথিক পুনঃ বলিলেন;—"আপনার পিতা গঙ্গারাম ঠাকুর অতিথি সেবায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন; আপনার ক্ষতি না করিলে কথনও পরের উপকার করা হয় না! আপনি পরম ধার্ম্মিক, আপনার কি ছদ্মবেশে থাকা শোভা পায়?"

হরিদাস বলিলেন,—এ সকলই সত্য। আমার ধরা দিতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু প্রতিশ্রুত আছি, বলরামের অনিষ্ট করিব না। আমার শাস্তি হইলে বলরাম প্রাণ রাখিবে না; আমি বড় কঠিন সমস্তায় পড়িয়াছি। আপনিই ব্যবস্থা বলুন।

পথিক।—কিরূপ কথায় প্রতিশ্রুত আছেন?

হরিদাস ঝুলি হইতে প্রতিজ্ঞা পত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন। সে প্রতিজ্ঞা পত্র দেখিয়া পথিকের প্রাণে এক স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। পথিক বলিল,—"আপনি আমার উপকারী বন্ধু, আপনাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পরম ধর্ম্ম। আপনাকে আশ্রয় দিব; এবং প্রয়োজন বুঝিলে কাজ ছাড়িব।"

হরিদাস আর এক সমস্তার মধ্যে পড়িলেন, ভাবিলেন, দরিদ্রের উপর এ সামান্ত অত্যাচার নহে। স্ত্রী কন্যা লইয়া ভদ্রলোক অকূলে ঝাঁপ দিতে চায়—সে কেবল আমারই জন্য। পুলিস কর্ম্মচারী হইয়াও আমাকে জানিয়া শুনিয়া স্থান দিয়াছে। ইহা প্রকাশ হইলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সম্ভব; সুতরাং এখানে থাকা কোন ক্রমেই শ্রেয় নহে। প্রকাশ্যে বলিলেন, মহাশয়, আপনি দেবতা, কিন্তু আমার স্থান দেবতার গৃহে নাই। আপনাকে বিপদে ফেলিতে আমি বাস্তবিকই কুণ্ঠিত। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি এই রাত্রেই স্থানান্তরে যাইব।

গৃহী বলিলেন—আমি আপনার সাথী হইব—আমাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

হরিদাস তাহাতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পথিক বলিলেন, মহাশয়, যদি ইহাতেও আপত্তি করেন, তবে আপনাকে ধরা দিতে হইবে! হয় এদিক, নয় ওদিক, একটা ঠিক হইবে। হয় ফকীর হই, নয় ধনী হই। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, বড় মানুষ হওয়া। দীক্ষা না দেন, আমি এখনই থানায় সংবাদ দিব।

হরিদাস এই দরিদ্র পরিবারকে দুঃখের সাগরে ভাসাইতেও অনিচ্ছুক, বলরামকে ডুবাইতেও নারাজ; সুতরাং এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। হরিদাস এ সমস্যার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইলেন, এবং কাতর স্বরে বলিলেন, মহাশয়, আমাকে আশ্রয় দিয়া শেষে এই রূপ বিপদে ফেলা মহাশয়ের উচিত নয়। আমি পায়ে ধরি, আমায় বিদায় দিন।

হরিদাসের বাক্‌রোধ হইল, দুনয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল।

পথিক কাজেই হরিদাসকে বিদায় দিলেন। কিন্তু হরিদাসের ঐ মলিন মূর্ত্তি, এই দিন হইতে পুলিস কর্ম্মচারীর জপমালা হইল। তিনি হরিদাসের প্রতিজ্ঞাপত্রে যে সকল কথা পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল শুভসংকল্প গ্রহণ করিলেন। হরিদাস বিদায় লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের ছায়া এই দীন পরিবারে চিরকালের জন্য বদ্ধ রহিয়া গেল। হরিদাস এই গৃহের দেবতার স্থান অধিকার করিলেন। পরদিন হইতে এই পরিবার দুঃখী দরিদ্রের আশ্রয় ভবনে পরিণত হইল!

হরিদাসের যে কষ্ট, সেই কষ্ট। কষ্ট বটে, কিন্তু ঐ পথিকের সাধু ব্যবহার, দয়া, প্রত্যুপকারের ইচ্ছা হরিদাসের হৃদয়ে এক স্বর্গের ছবি অঙ্কিত করিল। হরিদাস পথে—কিন্তু এই পরিবার তাঁহার হৃদয়ে। পরিবার গৃহে, কিন্তু হরিদাস দূরে থাকিয়াও সেখানে। এ এক আশ্চর্য্য মিলন। হরিদাস বুঝিলেন,—পৃথিবীতে ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য—এ সকলই আছে। হরিদাস দারুণ কষ্টেও এখন সুখী। কে বলে, দৃষ্টান্ত অপেক্ষা বক্তৃতা অধিক উপকারী?

হরিদাস কর্ত্তব্যের অনুরোধে দূরে, আরো দূরে যাইতে চান, কিন্তু তার প্রাণ বাঁধা যে ঘরে,সে ঘর ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে মন চায় না। সুতরাং এক দিন দুদিন কাছে কাছেই বেড়াইলেন। একবার মনে করেন, ফিরিয়া যাই, আবার ভাবেন, পথিক কি মনে করিবে? আবার ভাবেন, আমি কি বলরামকে ডুবাইব? আবার ভাবেন, আমার দ্বারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে না?—এই সকল কথা ভাবিলে মনটা একটু কঠোর হয়; দু দশ পা দূরে যান, কিন্তু কর্ত্তব্যের কথা হৃদয়টা শুনে না। হৃদয়টা ফিরিবেই ফিরিবে। বলরাম, বলরাম, শ্রীনাথ, শ্রীনাথ, তোমরা একবার দেখে যাও, দল ছাড়িয়া হরিদাস আজ কি বিষম বিপাকে পড়িয়াছে!!

চতুর্থ রাত্রে হরিদাস আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। কি এক বিষম আকর্ষণে দ্বিপ্রহর রজনীতে সেই আশ্রমে আবার পা ফেলিলেন। পা ফেলিয়া দেখিলেন—বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া যাইতেছে—গৃহে স্বামী স্ত্রী আহত অবস্থায় পতিত—মেয়েটী হাহাকার করিতেছে! কি ভীষণ দৃশ্য!! হরিদাসের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল—সব যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনে২ বলিলেন—"হরি হে, এ আবার কি লীলা দেখাইলে!!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দাস্তা দস্যু।

হরিদাসের সহিত পৃথক হইয়া বলরাম ও শ্রীনাথ আপন আপন পথ ধরিলেন। তিনের ব্রত এক, কিন্তু তিনের উপায় পৃথক। পরামর্শ নাই, পরস্পরের সাহায্য নাই, সুতরাং যার মনের গতি যে দিকে, সে যে সেই দিকেই চলিবে, তাহার বিচিত্র কি? হরিদাস প্রেমের দাস, ধর্ম্মের পুত্র, তিনি আপন ব্রত পালনের জন্য যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বলিয়াছি, বাকী অংশ পরে বলিব। বলরাম কি করিলেন, এই অধ্যায়ে বিবৃত করিতেছি। শ্রীনাথের কথা আরো পরে।

বলরাম শারীরিক বলের অবতার। তিনি জানিতেন, পৃথিবীর ধনী লোকেরাই দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে। কেহ উদরান্নের জন্য লালায়িত, আর কেহ এক দিনে দশ বিশ হাজার টাকা বিলাসে উড়াইতেছে! কেহ সামান্য বস্ত্রাভাবে শীত, উত্তাপ বা লজ্জা নিবারণ করিতে পারে না, আর কেহ হাজার হাজার টাকা পোষাক পরিচ্ছদে ফেলিতেছে! পৃথিবীতে কেন এত অসাম্য, কেন এত অত্যাচার, কেন এত দারিদ্র্য !! হায়, কাঙ্গালদিগের প্রতি কেহ কৃপা-নয়নে তাকায় না? কেহ দুঃখীর জন্য ভাবে না? কেহ তাহাদিগকে মানুষ করিতে চায় না? এই রূপ গভীর চিন্তা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। দেশের রাজা গরীবের কেহ নয়,—রাজাও বড় লোকের পোষ্যপুত্র। ঘুষ, উপঢৌকন, নজর—যাহা বল, সকলই বড় লোকের কীর্ত্তি;—সুতরাং রাজাও ধনীর বশ! ধনীর অপরাধের শাস্তি নাই,—কারণ টাকা, টাকা, টাকা। ধনীর সাত খুণ মাপ। পুলিস, ধনীর গোলাম। রাজা, গরীবের যম। পুলিস—দুঃখীর রক্ত-শোষক! হায়, জগতের এ কি দশা! এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে বলরাম অস্থির হইলেন। তিনি আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না, যাইতে যাইতে শেষে ধাঙ্গরদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাহাদের সরল প্রকৃতি, তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তাহাদের উন্নতির চেষ্টা জীবনের ব্রত করিয়া লইলেন। কিন্তু কিছু দিন তাহাদের সহিত বাস করিয়া বুঝিলেন যে, তাহাদের অভাবের শেষ নাই। তাহাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই—তাহাদের শিক্ষা নাই, চরিত্রের উন্নতি নাই। থাকার মধ্যে আছে—সরল ও সত্য ব্যবহার। কি

কারণে তাহাদের অভাব দূর হইতে পারে, ভাবিয়া তিনি কূল পাইলেন না। অর্থের অভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে কোল ও সাঁওতাল জাতির অধিনায়করূপে বলরাম দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

তান্তিয়া ভিলের ন্যায় বলরাম দান্তা নামে নানা স্থানে দস্যু বৃত্তিতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই অর্থ অসভ্য দরিদ্র কোল ও সাঁও তালদিগের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুটী দশটী নয়, শত শত দরিদ্র পরিবার এখন বলরামের আশ্রয় লইয়াছে। বলরাম এখন দরিদ্রের পিতা, ভাই, বন্ধু, সকলই। সুসভ্য সমাজে দান্তা দস্যু বলিয়া পরিচিত, ভদ্র সমাজে ঘৃণিত, ইংরাজ মহলে রাজদ্রোহী. কিন্তু দান্তা কোল ও সাঁওতাল-দিগের অকৃত্রিম সুহৃদ্—দুঃখী দরিদ্রের একমাত্র সহায়!

দক্ষিণে দামোদর নদী, উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে দান্তার রাজত্ব। দান্তা-দস্যুর ভয়ে রাঁচি ও হাজারিবাগের পথের লোক শশব্যস্ত! দান্তা দিবা দ্বিপ্রহরে কালেক্টারি লুণ্ঠন করিয়াছে, দান্তা প্রাতে পুলিস থানা পোড়াইয়া দিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে দান্তার শক্তি এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, মনে করিলে দান্তা এক দিনে পঞ্চাশ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারে। কি আলৌকিক ব্যাপার!!

দান্তা সাঁওতাল বলিয়া পরিচিত। এই রূপ জনশ্রুতি, দান্তার সময়ে সাঁওতাল বা কোল জাতির উপর গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইতেন না। দান্তা যা মনে করে, তাহাই করিতে পারে। তার অসীম সাহস, তার অসীম পরাক্রম, তার অসীম কার্য্য করিবার শক্তি। এই সকলের উপর তার অসীম দয়া।

পরেশনাথ পাহাড় বেহারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড়। ইহার নিম্নে মধুবন। পাহাড়ের নিম্নে মধুবনে জৈনদিগের তিন সম্প্রদায়ের সারি সারি মন্দির; পাহাড়ের উপরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। পাহাড়ের প্রতি শিখরে ছোট ছোট শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। এই পাহাড়ের উপরে উঠিলে একদিকে দামোদর নদী, অন্য দিকে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় সকল দৃষ্টিগোচর হয়। সে অতি অপরূপ দৃশ্য। এই পাহাড়ের গাত্রে, অপেক্ষাকৃত উচ্চে, অসংখ্য হরি-তকী বৃক্ষ, তন্নিম্নে অসংখ্য ঝরণার পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। সে নিবিড় অরণ্যে না আছে এমন জন্তু নাই। তাহার নীচে শালবন আরম্ভ। এই শালবনে দান্তার বসতি। এই পরেশনাথ পাহাড়, হাজারিবাগ ও রাঁচির পথ দান্তার

বিহারভূমি। জৈন সম্প্রদায় এদেশে বিখ্যাত ধনী। পরেশনাথ জৈন-দিগের প্রধান তীর্থ। দান্তা বুঝিয়া এখানে আড্ডা লইয়াছে। যাহারা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পরম বন্ধু, নিরামিস আহারী, তাহারা লোকের কষ্ট, দরিদ্রের অভাব বুঝে না। কি শোচনীয় অবস্থা! পরেশনাথের চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ লোক সপ্তাহে একবার কি দুইবার মাত্র অন্নাহার করে! হায়, তাহাও পেট ভরিয়া নহে! বৃক্ষতল ভিন্ন অনেকের গৃহ নাই। বৃক্ষের পত্র বা বল্কল ভিন্ন অনেকের পরিধানের বস্ত্র নাই! ইহা দেখিয়াও জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীরা সেদিকে তাকায় না! দান্তা তাই মধুবনের ধারে আড্ডা ফেলিয়াছে। দান্তার অসাধারণ পরাক্রমে জৈন সম্প্রদায়ের কতজন যে ধনপ্রাণে মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সে এই তিন বৎসরের মধ্যে!

দান্তা এইরূপ জঘন্য কাজ করে, পরের ধন লুণ্ঠন করে, কিন্তু আহার করে কি, থাকে কোথায়, কেমন স্বভাব? দান্তার প্রধান উপদেশ এই—স্ত্রীলোক মাত্রই মা। দান্তার দ্বিতীয় উপদেশ—দরিদ্র মাত্রই ভাই। তৃতীয় উপদেশ—নিজে না খাইয়া, না পরিয়া অন্যকে সর্ব্বস্ব দেওয়াই ধর্ম্ম। দান্তা দিনান্তে একবার আহার করে, বৃক্ষতলের কুঁড়ে ঘরে শয়ন করে, বৃক্ষের বল্কল পরিধান করে। মস্তকে তৈল নাই—শরীর বলিষ্ঠ, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্যহীন হইতেছে। দরিদ্রের অবস্থা স্মরণ করিলে দান্তার প্রাণ অস্থির হয়, চক্ষু হইতে জল পড়ে। দান্তা কি মানুষ?—না পশু?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসী।

মাঘ মাস, মধুবনে মেলা বসিয়াছে। যাত্রীর বিষম ধূম পড়িয়া গিয়াছে। দোকান পসারী সারি সারি বসিয়া গিয়াছে—গাড়ী ঘোড়ার আমদানিতে বন গুল্‌জার। লোকে লোকারণ্য। দিবা রাত্রি লোক আসিতেছে, দিবা রাত্রি লোক পাহাড়ের উপর উঠিতেছে। নিম্ন হইতে দেখা যায়, যেন পিপিলিকার শ্রেণী উঠিতেছে। লোক শ্রেণীর মধ্যে অর্দ্ধ উলঙ্গ, কঙ্কালবিশিষ্ট, গাঢ় নীলবর্ণ সাঁওতালদিগকে দেখিলে চক্ষের জল সম্বরণ হয় না। তাহারা মুটে, কাষ্ঠ-বাহকের কাজ, কেহ বা লোক-বাহকের কাজ

করিয়া, তিন চারি দিনে চারি বা পাঁচ পয়সা রোজগার করিবার জন্য বহু দূর হইতে আসিয়াছে! মধুবন হইতে পাহাড়ের উপরের মন্দির সকল ৬ মাইল ব্যবধান। কেহ ঝুলিতে, কেহ ডুলিতে, কেহ পাল্কীতে, কেহ পদব্রজে, যে যেরূপে পারিতেছে, পিপিলিকার সারির ন্যায় উপরে উঠিতেছে, এবং নামিতেছে। এই ৬ মাইলের মধ্যস্থানে মাত্র একটি জৈন বিশ্রাম গৃহ এবং খুব উপরে একখানি ডাকবাঙ্গলা আছে। জৈনবিশ্রাম গৃহের নিকটে একটী সুন্দর ঝরণা কুলকুল করিয়া বহিতেছে! এই গৃহের দেয়ালে নানারূপ কদর্য্য ও অশ্লীল ভাষায় কত কি লেখা রহিয়াছে! দেখিলেই বোধ হয় যেন পশুত্ব প্রচার করাই ধাম্মিক যাত্রীদিগের একটা প্রধান কার্য্য। কতজন কত অশ্লীল কথা লিখিয়া অকপট হৃদয়ের কালিমাময় চিত্র রাখিয়া গিয়াছে! পরেশনাথের পাহাড়ে, যাত্রীনিবাসে, পথে, বৃক্ষতলে—অগণ্য যাত্রীর ধূম! যেন কালীঘাটের মহাষ্টমি, বৈদ্যনাথ ও কাশীর শিবরাত্রি, জগন্নাথের রথযাত্রা।

দাস্তা এখন বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া মেলার যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন! কে কোথা হইতে আসিয়াছে, কোন্ দোকান কেমন চলিতেছে, এই সকল অনুসন্ধান করা তাঁহার কাজ। তিনি দিনে বাবু, রাত্রে দস্যু। দিনে দেখিয়া রাখেন, রাত্রে কার্য্যোদ্ধার করেন। দাস্তা যাত্রীর দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাবুরা দল বাঁধিয়া এই মেলায় আনন্দ-বিহার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু দাস্তা তাহা দিতেছেন না! স্ত্রী পুরুষের এই জঘন্য মেলা সে একা ভাঙ্গিবে, এই যেন পণ! ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, ব্যভিচার, লাম্পট্য,—দাস্তার অসহ্য। দাস্তা, সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ মাঘী পূর্ণিমা। চাঁদনী রাত্রে আজ পাহাড়ের কি অপরূপ শোভা হইয়াছে! গাছে গাছে,পাতায় পাতায় চাঁদের আলো ঝলসিয়া পড়িতেছে—চাঁদ হাসিয়াই অধীর! ফুল ফুটিয়াছে, তাকে চুম্বন করিতেছে, পাখী গাইতেছে, তাকে আরো মাতাইতেছে, লোক চলিয়াছে, তাহাদিগকে নাচাইতেছে—চাঁদের আজ যেন কি এক মধুর ব্রত!! মধুর নিশি, চতুর্দ্দিক মধুময়। মধুবন আজ মধুময়। মধুমেলা আজ মধুময়। একা চাঁদ ঐ অনন্ত গগনে থাকিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য মাতাইয়া তুলিতেছে। বলিহারি যাই!

গাছের তলায় তলায় আজ প্রণয়ীর দল আনন্দে বিহার করিতেছে। কত গল্প চলিয়াছে, আনন্দের মেলা আর ফুরায় না। দাস্তা আজ ভ্রমরের ন্যায়

সকল ফুলের আঘ্রাণ লইতেছেন! দেখিতেছেন, কোন্ ফুলের কেমন গন্ধ!

এই মেলা দেখিয়া কে না বলিবে যে, বাঙ্গালী বাবুদের রিপু-পরায়ণতা কিছু অধিক! যত বাঙ্গালী আসিয়াছে—অধিকাংশের সঙ্গেই উপপত্নী। কি বিভ্রাট, একি তীর্থ না নরক? দেখিয়া দেখিয়া দাস্তা বাবু মনে মনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

এই সময়ে দাস্তা দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী একটি যুবতীর সহিত নিভৃতে কত কি কথা বলিতেছেন। দাস্তা বাবু নিকটবর্ত্তী হইলেন। সন্ন্যাসী বিরক্ত হইলেন। ভাবগতিক দেখিয়া দাস্তাবাবুর বড়ই সন্দেহ হইল, তিনি আরো নিকটস্থ হইলেন। সন্ন্যাসী আরো বিরক্ত হইলেন। দাস্তা ছাড়িবার লোক নন্, বলিলেন, "কোন্ হ্যায়?"

সন্ন্যাসী বাঙ্গালী, হিন্দিভাষা শুনিয়া লোকটাকে বোকা মেড়া হিন্দুস্থানী বলিয়া বুঝিলেন, বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তোর বাবা?"

দাস্তা।—বাবার সঙ্গে ও কে?

এবার বাঙ্গলা কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বড়ই অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষমা চাহিলেন, বলিলেন, মহাশয়ের নাম, মহাশয়ের বাড়ী?

দাস্তা।—মহাশয়ের বাড়ী?

সন্ন্যাসী।—কৃষ্ণনগর। এখন কলিকাতায় থাকা হয়।

দাস্তা।—এ বেশে কেন?

সন্ন্যাসী।—এই কাজের জন্য!

দাস্তা বুঝিলেন, লোক্‌টা বড়ই বেল্লিক, আরো বুঝিলেন, লোক্‌টা পাকিয়া গিয়াছে, বলিলেন, কোথা হইতে আসা হইয়াছে?

সন্ন্যাসী।—আপততঃ কলিকাতা হইতে?

দাস্তা।—ইঁহার বাড়ী?

সন্ন্যাসী একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর ভাবিলেন, এত দূরের পথিকের নিকট সত্য কথা বলায় দোষ নাই, বলিলেন, ইহার বাড়ী বলরামপুর চিনিলেন ত?

বলরামপুরের কথা শুনিয়া দাস্তা বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কার কন্যা?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তারিণী চক্রবর্ত্তীর কন্যা। আপনি কি তাঁহাকে জানেন?"

দাস্তাবাবু কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, তারিণী চক্রবর্ত্তীর বিধবা কন্যা?

সন্ন্যাসী।—পূর্ব্বে বিধবা ছিলেন বটে, এখন সধবা। এখন ইনি আমার পত্নী।

দাস্তা।—আপনার নাম?

সন্ন্যাসী।—দীননাথ জ্যোতিষী, পূর্ব্বের উপাধি উপাধ্যায়।

দাস্তা বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল; ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, ইনি আপনার পরিণীতা স্ত্রী?

সন্ন্যাসী।—পরিণীতাই বটে, আমাদের ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা। আপনার বাড়ী কোথায়?

দাস্তাবাবু কথার প্রকৃত উত্তর দিলেন না, বলিলেন, আপনার সহিত অনেক কথা আছে। আমার বাড়ীও বঙ্গপ্রদেশে। রাত্রে আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন?

সন্ন্যাসী সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। সঙ্গের যুবতী চুপিচুপি দুই তিন বার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসী শুনে নাই। সুতরাং বলা অধিকন্তু যে সন্ন্যাসীর বুদ্ধিটা কিছু মোটা। হউক মোটা, তবুও যেন তার নিকট কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। এতদূর বলিয়া শেষ উত্তরটা না দিলেই বা কিরূপে চলে; সুতরাং বাসার কথাটীও বলিলেন। দাস্তা বাবু চলিয়া গেলেন। যুবতী সন্ন্যাসীকে যারপর নাই তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, বোধ হয় ইহার বাড়ী আমাদের দেশে হইবে। যাহা হউক, আজ আর আমাদের বাসায় যাইয়া কাজ নাই, এস, আমরা পলায়ন করি।

সন্ন্যাসী সাহসী পুরুষ, সুতরাং স্ত্রীলোকের কথায় কাণ দিলেন না। দাস্তা বাবুর ক্ষমতাই কি, সে কি করিবে? এই সকল প্রবোধ বা সাহস বাক্যে ভুলাইয়া যুবতীকে লইয়া সন্ন্যাসী যথা সময়ে বাসায় উপনীত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত।

রাত্রি খুব গভীর হইয়াছে, আকাশের চাঁদ মাথার উপর চলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জ্যোতি একটু নিষ্প্রভ হইয়াছে। তার উপর আবার

কুহেলিকার ঢেউ উঠিয়াছে, গাছের পাতায় পাতায় শিশির পড়িয়াছে, আমলকীর ডালে ডালে অসংখ্য মাকড়সার জাল, সে সকল শিশিরে একেবারে সিক্ত হইয়া গিয়াছে—বোধ হইতেছে যেন গাছে গাছে বরফের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জালে অসংখ্য মুক্তা ঝুলিতেছে। দুই একটা পাখী কদাচিৎ ডাকিতেছে, কিন্তু এখন তাদের স্বর যেন কেমন কর্কশ হইয়া গিয়াছে। উৎসবের কেলী থামিয়াছে—পরেশনাথের পথ এখন বিশ্রাম পাইয়াছে। বনের পশুরাও যেন এখন নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে—তাদেরও সাড়া শব্দ নাই। চতুর্দ্দিকে গাঢ় নীরবতা—অনন্ত কালসাগরে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। প্রকৃতিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে,—সে যেন এখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে;—আর নড়িতে চড়িতে পারিতেছে না। প্রবল ঝড়ের পর নদী যেন এখন শীতল হইয়াছে।

এই নিস্তব্ধ গাঢ় রজনীতে—সন্ন্যাসীর বাটীতে দস্যুর দল প্রবেশ করিল। যুবতীর মনটা কেমন চঞ্চল হইয়াছিল, তার চক্ষে ঘুম বসে নাই। সন্ন্যাসী আধ ঘুম আধ জাগরণে ছিল; গৃহে মৃদু মৃদু দীপ জ্বলিতেছিল। দস্যুর দল দেখিয়া যুবতী ভীতা হইলেন, এবং যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সাড়া পাইয়া সন্ন্যাসীও জাগরিত হইলেন। যুবতী অসময় বুঝিয়া বুকে সাহস এবং ধৈর্য্য বাঁধিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা। দেখিতে দেখিতে গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। এত লোকের সহিত সাহস করা মূর্খতা মাত্র। সন্ন্যাসী ভীত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আধ আধ ক্রন্দন স্বরে—বলিলেন—"বাবা তোদের পায়ে ধরি, আমাকে কিছু বলিস্ নে, যা থাকে সব তোরা নিয়ে যা।" দস্যুরা সে কথায় কাণ দিল না, তাহারা বলপূর্ব্বক সন্ন্যাসী ও যুবতীকে বাঁধিয়া ফেলিল। তিনি যুবতীর গায় হাত দিতে অনেকবার মিনতি সহকারে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে কথা শুনে কে? দস্যুরাজের আদেশ, "উভয়কে বাঁধিয়া লইয়া আসিবে।" সে আদেশ নীরবে, বিনা বাধায় প্রতিপালিত হইল। গৃহে যে দ্রব্যাদি ছিল, তাহা দস্যুরা স্পর্শও করিল না। উভয়কে বাঁধিয়া দস্যুদল নিমিষের মধ্যে গভীর অরণ্যের মধ্যে ইহাদিগকে লইয়া চলিল। এমন নিবিড় অরণ্য যে, আকাশের চাঁদের জ্যোতি কোথাও পৌঁছে নাই। সে রাজ্যে যেন চন্দ্র ও সূর্য্যের আধিপত্য মোটেই নাই। সে রাজ্যে যেন রাজারও পরাক্রম নাই। সে যেন মগের মুল্লুক্। সে বনের রাজা—দাস্তাদস্যু।

দাস্তার সম্মুখে উভয়ে আনীত হইল। তখন রাত্রি অতি অল্পই আছে। নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থিত একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের নিম্নে পল্লবে নির্ম্মিত দাস্তার কুটীর। দাস্তা এখন আর বাবু নন, পূর্ব্বের বেশ নাই, বল্কল পরিধানে, মস্তকে রুক্ষ রুক্ষ কেশরাশি—সর্ব্বাঙ্গে যেন কি লেপিত। সে এক ভীষণ মূর্ত্তি। সম্মুখে আসামীদ্বয় আনীত হইবামাত্র সেই নিস্তব্ধ বন কাঁপাইয়া দস্যুদল আনন্দ অন্তরে গম্ভীর বিজয়-ধ্বনি করিল। সে হুঙ্কারে বনের পশু পক্ষীর প্রাণ পর্য্যন্তও কাঁপিল। সন্ন্যাসী ও যুবতীর প্রাণ ভয়ে জড় সড় হইল। উভয়ে দস্যুরাজের সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

দাস্তা গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্ন্যাসি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঠিক উত্তর দিবে, নচেৎ তোমার শির লইব। বলরামপুর যাইবার সময় এক দিন তুমি সোনাপুরে অপেক্ষা করিয়াছিলে কি ?"

সন্ন্যাসী।—করিয়াছিলাম।

দাস্তা।—কোথায় ছিলে ?

সন্ন্যাসী।—হরিদাস ঠাকুরের বাড়ীতে।

দাস্তা।—তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতে ?

সন্ন্যাসী।—না।

দাস্তা।—তাহার সহিত এ সম্বন্ধে তোমার কোন কথাবার্ত্তা হয়েছিল ?

সন্ন্যাসী।—না। কোন কথাই হয় নাই।

দাস্তা।—তারিণী চক্রবর্ত্তীর সহিত তোমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল ?

সন্ন্যাসী।—ছিল।

দাস্তা।—কোথায় ?

সন্ন্যাসী।—তিনি যখন ভাগলপুরে চাকরী করিতেন, তখন আমাকে দয়া করিয়া বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। আমি তখন বড়ই বিপন্ন হয়েছিলাম।

দাস্তা।—এই যুবতীর সহিত কখন তোমার আলাপ হয় ?

সন্ন্যাসী।—ভাগলপুরে।

দাস্তা।—তারিণী বাবু তাহা জানিতেন ?

সন্ন্যাসী।—জানিতেন। কিন্তু তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতাম, ইনি আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, সুতরাং তিনি আমাকে কোন সন্দেহের চক্ষে দেখেন নাই।

দান্তা।—সেই সময়েই কি তোমাদের প্রণয় হয় ?

সন্ন্যাসী।—আজ্ঞা হাঁ।

দান্তা।—তারিণী বাবুকে সে কথা বল নাই কেন ?

সন্ন্যাসী।—তিনি বাধা দিবেন বলিয়া।

দান্তা।—তুমি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক—নরকেও তোমার স্থান নাই! শেষে কি তিনি তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?

সন্ন্যাসী।—পারিয়াছিলেন।

দান্তা—তার পর কি হইল ?

সন্ন্যাসী।—তারপর আমি তাড়িত হই। তিনি বিদায় লইয়া কলিকাতায় যান। দুই মাস পর আমি আবার কলিকাতার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি পূর্ব্ব স্নেহ বশত আমাকে আবার ক্ষমা করেন, আবার বাসায় স্থান দেন। কিন্তু ক্রমে আমাদের ভাব আবার প্রকাশ পাইল। তিনি বিরক্ত হইয়া আমাকে আবার তাড়াইয়া দিলেন; এবং অবশেষে তিনি পেন্সন লইয়া চিরদিনের জন্য বলরামপুব চলিয়া যাইলেন। আমি তখন নিরুপায় হইয়া অকূল পাতারে ঝাঁপ দিলাম। এই সময়ে মানুষকে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জনে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুই চারি খানি পুস্তক সঙ্কলন করিলাম। অনুরোধ ও খোসামুদী করিয়া তাহা পাঠ্য লিষ্টভুক্ত করিয়া লইলাম। বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। তারপর জ্যোতিষী উপাধি ধারণ করিলাম, পত্রিকায় জাঁকাল বিজ্ঞাপন দিলাম, বাড়ীভাড়া করিলাম। কলিকাতার লোক না-মানুষ না-পশু, কলিকাতার লোককে ঠকান বড় সহজ। দলে দলে লোক অদৃষ্ট গণনা করিবার জন্য আমার নিকট আসিতে লাগিল। একে সন্ন্যাসীর বেশ, ধর্ম্মের ফোঁটা কপালে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, হাজার হাজার লোক প্রতারিত হইল। বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইল, অনেক বন্ধু জুটিল—খুব পসার হইল। এই সময়ে বলরামপুরের অনেক পত্র পাই। ইনি পিতার তাড়নায় অধীরা হন। শেষে পলায়ন করাই স্থির হয়। আমি একাকী বলরামপুর যাই। রাত্রে ইহাকে লইয়া পলাইয়া কলিকাতায় যাই। সেখানে না পাওয়া যায়, এমন লোক নয়। কলিকাতায় বিধবা বিবাহের একটা দল আছে। সেই দলের সাহায্যে ইহাকে বিবাহ করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে চল হইতে পারিলাম না। কাজেই ইহাঁকে পৃথক বাড়ীতে রাখিতে হইল।

দাস্তা এই সময়ে মনের উত্তেজনায় কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন,—এখনও সে ব্যবসা চলিতেছে ত ?

সন্ন্যাসী।—বেশ চলিতেছে। এখন কলিকাতায় একটী বাড়ী করিয়াছি। এখন দশ জন বড় লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছি। সে কেবল ইহাঁরই সাহায্যে। ইহাঁর অনেক গুণ। ইনি বেশ লেখা পড়া, গাওনা বাজনা জানেন; দশজন ভদ্রলোকের সহিত বেশ মিলিতে মিশিতে জানেন। ইনি একজন accomplished Lady, দেবী বিশেষ।

দাস্তা।—শুনিয়াছি, পামর, ঢের শুনিয়াছি। ভণ্ড, বিধবা বিবাহের নামে তুই কলঙ্ক আনিয়াছিস্! তুই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিস্ আজও তুই ভদ্র সমাজে মুখ দেখাইতেছিস্? সমাজকে শতধিক, দেশকে শতধিক! তোর ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের নরকেও স্থান নাই। তোর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এই বলিয়া দস্যুরাজ আদেশ করিলেন,— "ইহার নাক কাণ কাটিয়া জঙ্গল পার করিয়া দিয়া এস। চক্ষু বাঁধিয়া এমন পথ দিয়া লইয়া যাইবে, কস্মিন্‌কালেও যেন পথ চিনিতে না পারে।"

আদেশ মাত্র দুই ব্যক্তি সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিল। সন্ন্যাসীর প্রাণ উড়িয়া গেল, আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানের যো থাকিবে না, ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। দস্যুরাজের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—"দেব, রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন, এমন কাজ আর কখনও করিব না।"

দাস্তা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। গম্ভীর ভাবে দিক কাঁপাইয়া পুনঃ সেই আদেশ করিলেন। লোকেরা আদেশ প্রতিপালন করিল। যুবতীর সমক্ষে এইরূপ হওয়ায় তাঁর হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিল। তাঁহার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িল। জাতি, কুল, মান—সব ডুবাইয়া যার সঙ্গে আসিলাম, এতদিনে তাহাকেও হারাইলাম, এই ভাবনায় প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নিজের পরিণাম কি হইবে, ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। কথা বলিতে ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্‌নিষ্ক্রান্ত হইল না।

সন্ন্যাসীকে স্থানান্তরে লইয়া গেলে দাস্তা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— সন্ন্যাসীর পরিণাম দেখিলে, তুমি এখন কি করিবে ?

যুবতী।—যা আপনার আদেশ।

দাস্তা।—দেশে ফিরিয়া যাইবে ?

যুবতী।—এ কলঙ্কিত মুখ লইয়া দেশে যাইতে পারিব না।

দাস্তা।—তবে কি করিবে, কলিকাতায় যাইবে ?

যুবতী।—আপনার ইচ্ছা হইলে প্রস্তুত আছি। আর দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই।

দাস্তা।—সেখানে ব্যবসা চালাইবে ?

যুবতীর মুখ লজ্জায় মলিন হইল। দাস্তা ভাবিলেন, কি শোচনীয় অবস্থা! পূর্ব্বে দাস্তা হরিদাসের নিকট একবার শুনিয়াছিলেন, কলিকাতা বেশ্যাদিগের মধ্যে ১২ আনা পরিমাণ স্ত্রীলোক ভদ্রঘরের বালবিধবা! আজ একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়া সে কথাকে সত্য বলিয়াই বোধ হইল। যাহাদের কুলে কালি পড়িয়াছে, তাহারা দাঁড়াইবে কোথা ? যাহারা দারুণ বৈধব্য আগুনে পুড়িতেছে, তাহাদের কষ্ট ও এইরূপ পরিণামের কথা ভাবিয়া দাস্তা-দস্যু হিন্দু-সমাজকে বারম্বার ধিক্কার দিলেন। যুবতীর প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া হইল। ভাবিলেন, রিপুর যন্ত্রণা ও পশুপ্রকৃতি পুরুষের প্রলোভনের হাত এড়াইতে না পারায় এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু এখন ইহাঁকে কি করা যায় ? কোথায় রাখা যায় ? কে ইহার ধর্ম্মের জন্য দায়ী ? ভাবিয়া বড়ই প্রাণ আকুল হইল। চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

যুবতী বুঝিল, তার অবস্থা স্মরণ করিয়াই দস্যুরাজ এত ব্যাকুল হইতেছেন। দস্যুর হৃদয়ে এত দয়া, দেখিয়া যুবতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তার প্রাণের মধ্যে কেমন একরূপ ভাব হইল। যুবতী বলিল—"দেব, আমি কলিকাতায় যাইব না, আপনার এখানেই থাকিব।"

দাস্তা আর উপায় না দেখিয়া যুবতীকে যত্নপূর্ব্বক কাছে রাখিলেন। পরদিন প্রাতে নিম্নলিখিত পত্র সহ একজন লোক বলরামপুর পাঠাইলেন।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী,

মহাশয় সমীপে—

দেব, আমি এখন কোথায় আছি, তাহার অনুসন্ধান করিবেন না। তাহা জানিয়া প্রয়োজন নাই, জানিতে পারিবেন না। ঘটনাক্রমে একজন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আপনার কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার নিকট রাখিয়াছি। এখানে কোন ভয় নাই। আপনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, জানাইবেন। আমার বিবেচনায়, অনুতপ্তা পতিতা রমণীকে সমাজে আশ্রয় না দিলে সমাজের দিন দিন অশেষ অমঙ্গল হইবে। আপনার অভিপ্রায় আমাকে শীঘ্র জানাইবেন।

আপনার স্নেহপ্রার্থী—বলরাম।

বিদায়ের সময়ে লোকটিকে বলিয়া দিলেন, কোনরূপে ঠিকানার পরিচয় দিবে না। দিলে বড়ই অমঙ্গল হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেবার জীবন।

যথাসময়ে দাস্তার প্রেরিত লোক বলরামপুর হইতে প্রত্যুত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। তারিণী চক্রবর্ত্তী একজন সুশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি পত্রের নিম্নলিখিত রূপ উত্তর দিয়াছিলেন।

পরম শুভানুধ্যায়ী—শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম রায়,

মহাশয় সমীপে—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি এখন কোথায়, কি ভাবে আছ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তুমি যে জীবিত আছ, ইহাতেই যারপর নাই সুখী হইলাম। তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ও পরম সহায়, সুতরাং আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতা তোমার সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন।

পত্রে অবগত হইলাম, আমার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি, নয়নের জ্যোতি, সেবা এখন তোমার আশ্রয়ে। তুমি কিরূপে সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে সেবাকে উদ্ধার করিলে, জানিতে বাসনা; আমি সন্ন্যাসীকে সন্তানবৎ স্নেহে আশ্রয় দিয়াছিলাম। সেবা তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সেও ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিত। সুতরাং আমার মনে কোন রূপ সন্দেহ ছিল না। সে যে তলে তলে এইরূপ অভিসন্ধি পাকাইতেছিল, বিধাতা সাক্ষী, আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। সে বিশ্বাসঘাতক যে আমার কপাল ভাঙ্গিবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই! এখন মানুষের কেমন একরূপ স্বভাব হইয়াছে, উপকারী বন্ধুর রক্ত শোষণ না করিলে পিপাসা মিটে না! লোকের কেমন একরূপ বিকৃত মন হইয়াছে, এখন আর সম্বন্ধের বাদ বিচার করে না;—প্রতারণা, ব্যভিচার ও অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সময় মানুষ সম্বন্ধটাও গণনায় আনে না! কি শোচনীয় অবস্থা! তুমি জান, আমি একমাত্র

অধিকারী। সেবা যখন বিধবা হইল, মনে করিয়াছিলাম, যেরূপে পারি তাহার একটা উপায় করিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদর্শিত পথ ধরিতে খুব ইচ্ছা ছিল। তুমি জান, আমি সমাজের বড় একটা ধার ধারি না। মেয়ের মঙ্গলের জন্য অবশ্য প্রাণপণে যত্ন করিতাম। এই উদ্দেশ্যে, সেবাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছিলাম। সেবা যে আমাদের ভালবাসা ভুলিয়া প্রতাবকের সঙ্গ ধরিবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। তার কিসের ভাবনা, কিসের কষ্ট ছিল! আমার হৃদয়ে সেবা জন্মের মত শেল বিদ্ধ করিয়াছে!!

এখন তার স্নেহ, তার প্রকৃতি, তার কমনীয় কান্তি ভুলিয়াছি।—প্রাণকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়াছি—"সেবা যেন পৃথিবীতে নাই।" সে ত মরিয়াছে!! যে দিন সে ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, সেই দিন তার মৃত্যু হইয়াছে! যে মৃত, তার জন্য আর আশা রাখিয়া কি করিব? অতি কষ্টে অপত্য স্নেহ জন্মের মত হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়াছি।

সেবার মা এখনও জীবিতা আছেন। তিনি কন্যাকে ভুলিতে পারিতেছেন না। ক্রন্দন তাঁর জীবন সম্বল হইয়াছে—স্নান আহার জন্মের শোধ বিদায় দিয়াছেন। এখনও যে আছেন, সে কেবল সেবাকে দেখিবার জন্য! সেবা মাতৃ-স্নেহের মমতা কি বুঝিবে? সেবা পিশাচিনী, রাক্ষসী।

তোমার প্রস্তাব সেবার মাতাকে বলি নাই, বলিলে সে এখনই ক্ষেপিয়া উঠিবে। আমি তাহাকে ঠিক রাখিতে পারিব না।

সেবা যতদিন গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্ম-সংশোধনে সমর্থা না হইবে, ততদিন পিত্রালয়ে তার আর স্থান নাই। সে মাতৃঘাতিনীকে বলিবে, মৃত্যুই তার পক্ষে এখন একমাত্র বৈকুণ্ঠের পথ!

তোমার সাধু ইচ্ছাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। বিধাতার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে বৃদ্ধের এই প্রার্থনা, তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবী রাখিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে রত রাখুন।

শেষ অনুরোধ এই—সেবার কথা আমাকে যেন আর শুনিতে না হয়।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শ্রীতারিণী চরণ।

এই পত্র পাঠ করিয়া বলরাম বুঝিলেন, বৃদ্ধের প্রাণে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আর উঠিবার নয়। ভাবিলেন, হায়, তবে সেবার গতি এখন কি হইবে? সেবা এখন কোথায় দাঁড়াইবে? কে আশ্রয় দিবে, কে দিবে? বলরাম ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেন না। শ্রীনাথ ও হরি-

দাসকে সবিশেষ জানাইতে ইচ্ছা, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় আছেন, তিনি জানেন না। যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের মিলনের কথা, তাহার এখনও অনেক বাকী আছে। সুতরাং বলরাম আর উপায়ান্তর পাইলেন না। অগত্যা সেবার জন্য বৃক্ষমূলেই একটু কুঁড়ে বাঁধিয়া দিলেন।

সেবাকে পত্রখানি দেখান হইল। সেবা মাতার স্নেহ মমতা ছিঁড়িয়া কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, এত দিনে উত্তমরূপে বুঝিল। পিতাও পিতার মত পিতা, যে সে অত্যাচারী পিতার ন্যায় নহেন। পিতা তার মঙ্গলের জন্য কি না করিয়াছেন, মাতা তার মঙ্গলের জন্য কিনা করিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, সেবা আজ বৃক্ষতলে নিরাশ্রয় অবস্থায়, সব একে একে ভাবিল। রিপুর উত্তেজনায় কেন মত্ত হইলাম, কেন ধর্ম্ম ভুলিলাম, কেন প্রতারকের ছলনায় ভুলিলাম, এরূপ নানা কথা প্রাণে উঠিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পিতামাতার স্নেহ আর পাইব না? হায়—মায়ের মুখ আর দেখিব না! প্রসন্নময়ী দেবী—মায়ের দয়া কি অপরিসীম! মা এখনও আমার জন্য অধীরা। পিতার বিরক্তির আগুন না নিবিলে সেই সর্ব্ব দুঃখ-হরণকারিণী মাতৃমূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না! কিন্তু পিতার বিরক্তি কি কখনও নির্ব্বাণ হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেবার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপ অনুতাপের অবস্থায় সেবার মন বড়ই বিকল হইল, ভাবিলেন, পিতা লিখিয়াছেন, "মৃত্যুই এখন আমার পক্ষে একমাত্র বৈকুণ্ঠের পথ।" পিতার উপদেশ কি মধুর! আমার এই কলঙ্কিত জীবন রাখিয়া কাজ কি? রিপু সেবাতেই আমার সব কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন আর বাঁচিয়া কাজ কি? জগতে আমার আর মঙ্গল নাই। এখন মরিলেই জীবন সার্থক হয়, জুড়ায়। হায়, তবে পিতার উপদেশই শিরোধার্য্য করি না কেন?

ছেলেবেলা স্বর্ণকলির সহিত এক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দেখা ছিল, কথা প্রসঙ্গে সে বলিয়াছিল, "আত্মঘাতে মহাপাপ!—আরো বলিয়াছিল, যত অপরাধই হউক না কেন, হরির চরণে পড়িলে ও আত্ম শরীর মন অন্যের সেবায় উৎসর্গ করিলে, সব পাপের ক্ষয় হয়।" তার কথাটা তখন কত মধুর বোধ হইয়াছিল! তার কথাই কি ঠিক? না—পিতার কথাই ঠিক? লোকে বলে, পিতার ন্যায় আর গুরু নাই, পিতার ন্যায় আর হিতাকাঙ্ক্ষী ন' পিতার কথা ও স্বর্ণের কথা পরস্পর বিরোধী। স্বর্ণকেও ত

ক্ষত প্রশংসা করিত। কার কথা ঠিক? কে একথা আমাকে বলিয়া দিবে? এমন লোক কোথায় মিলে?

পর-সেবায় জীবন চালিতে পারিলে সুখ পাওয়া যায়, একথা সত্য। কিন্তু আমি যে অস্পৃশ্যা, আমার সেবা কে লইবে?—না—আমার মরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পিতার কথাই তবে শিরোধার্য্য করি!

আবার ভাবিল—পিতার কথা ঠিক সত্য। আমার চরিত্রে লোকে কলঙ্ক আরোপ করিলে তাহা কি আমি সহ্য করিতে পারিব? লোকের বিদ্রূপ-বাণে যখন দেহ মনকে ক্ষতবিক্ষত করিবে, তখন কেমন করে জীবন রাখিব?—না—মরাই আমার এক মাত্র পথ!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেবা বড়ই অধীরা হইয়া পড়িল। আহার নিদ্রা সকলই এক প্রকার পরিত্যাগ করিল। দিবানিশি ভাবিতে ভাবিতে শরীর মলিন হইল, সোণার রূপ কাল হইয়া উঠিল। গ্রন্থকার বলেন, অনুতাপের আগুন যাহাকে দগ্ধ করে, তাহার আর বাহ্যরূপ থাকে না। বাহির ভস্ম হইলে তবে ভিতরের উজ্জ্বল রূপ বাহির হয়। ইহাকেই দ্বিজাত্মা বলে।

দিনে দিনে সেবার জীবনেও তাহাই হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার উপদেশ ও স্বর্ণের কথায় বড় দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে—ঠিক মীমাংসা হয় নাই। তার উপর আবার বলরাম এক দিন বলিলেন—"যার মান অভি-মান আছে, সে এখনও প্রকৃত ধর্ম্মের অধিকারী হয় নাই। নিন্দার ভয় ও প্রশংসার পিপাসাকে যে বলি দিতে না পারিয়াছে,—আত্মবিসর্জ্জন যাহার না ঘটিয়াছে, তাহার ধর্ম্মে অধিকার জন্মে নাই। আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন অন্যের সেবা হয় না। পরোপকার করিতে যাইয়া যাহারা আপনার হিত বা যশ মান চায়, তাহারা প্রতারক। প্রকৃত সেবক যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও তিরস্কারই তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ।"

এই কথায় সেবার মনের জোয়ার একটু থতমত হইয়াছে। সে ভাবি-তেছে, নিন্দার ভয়ে প্রাণ দিব কেন? প্রাণ দিব না—স্বর্ণের কথায়। শরীর দেব পিতার উপদেশে। শরীর দেওয়াই ত মৃত্যু। শরীর তবে অন্যের সেবায় বিসর্জ্জন দি। প্রাণময় রাজ্যে বাস করি। সুখস্পৃহা, বাসনা—সব ডুবাই। এইরূপ ভাবিয়া সেবা মস্তকের কেশ কর্ত্তন বেশভূষা পরিত্যাগ করিল, একাহার ধরিল, এবং অন্যের

সেবার প্রাণমন উৎসর্গ করিল। এইরূপে সেবা বলরামের প্রধান সহায় হইল। দিনে দিনে সেবাব জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনাথ বাবু।

শ্রীনাথেব বুদ্ধি কিছু প্রথব—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সংসারের চক্ষে ধূলি দিয়া চলিতে পারা, তাঁর পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপাব নহে। বলবামের ন্যায় শ্রীনাথও হরিদাসের বাল্যবন্ধু। কেবল হরিদাসের বন্ধুত্বের খাতিরে ইহারা ধর্ম্মের ধার ধারেন, কথনও মিষ্ট হন, কথনও দুই একটা ভাল কাজ করিয়া থাকেন। মূল কথা, শ্রীনাথ ও বলরাম মানসিক ও শারীরিক বলের প্রতিকৃতি মাত্র। সাধারণতঃ সংসারের বুদ্ধিমান ও বলবান লোকেরা ধর্ম্মকর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না। ইঁহাদেরও দশা তাহাই। হরিদাসের খাতির বড় শক্ত খাতির, সুতরাং পবোপকার প্রভৃতি কার্য্যে ইঁহারা সময়ে সময়ে ব্রতী হন। কিন্তু খাতিবে ধর্ম্ম ও চবিত্রলাভ হয় না। ধর্ম্ম ও চরিত্র ভিন্ন মানুষ কি কথনও পুণ্যের অধিকারী হইতে পারে? কথনও কি চিরস্থায়ী মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিতে পারে? যাহারা ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, তাহাবা আজ দেশসংস্কারক, কাল নর-হত্যাকারী,—আজ তাহারা দেশ-হিতৈষী, কাল তাহারা যশোলিপ্সু দেশেব পরম বৈরী। ধর্ম্মহীন, চরিত্র-হীন হিতৈষীর মুখে ছাই পড়ুক। দুষ্টমতি শ্রীনাথের জীবনকাহিনীর আর এক বিভাগ উন্মুক্ত হইতেছে।

বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া শ্রীনাথ স্বাধীন হইলেন। তিনি আপনার বুদ্ধি প্রভাবে পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভের প্রয়াসী হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে একথানি বজরা ভাড়া করিলেন, আনুষঙ্গিক লোক জন সব নিযুক্ত করি-লেন। বজরার সাজসজ্জা দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। সব ভাড়া করা জিনিস, লোকজনকে মাসান্তে বেতন দিতে হইবে, সুতরাং ভাবনা নাই। বজরার এক কামরায় উৎকৃষ্ট মখমলের গদি, তাহাতে জরির কাজকরা, তাহাতে বহুমূল্যের কিনখাপের চাদর। তার ধারে ঐরূপ তাকিয়া, রূপার পিকদানি, রূপার আলবোলা, রূপার ছড়ি ইত্যাদি। অন্য গৃহে শ্বেত প্রস্তরের

টেবিল এবং মেহগ্নি কাঠের গৃহসজ্জা। বাবুর পোষাক পরিচ্ছদ সমস্ত নূতন রূপ প্রস্তুত হইয়াছে। দেখিলে কে মনে করিবে, যেমন তেমন বাবু! শ্রীনাথ বাবুর বজরা ঢাকা সহর অতিক্রম করিয়া নারায়ণগঞ্জে লাগিয়াছে। বজরায় সমস্ত সজ্জিত রহিয়াছে, বাবু কিন্তু গুরুদশাগ্রস্ত,—গলায় কাছা, পরিধানে সামান্য থান। বাবু পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যেন নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জে বজরা লাগিলে বহু দোকানের লোকেরা বজরা ঘেরিল। বাবু কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না, বলিলেন। বাবু বলিলেন, আমি সামান্য ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব, কেবল ১৫০০০ হাজার টাকার দ্রব্যাদি চাই। কিন্তু অনুরোধ, কেহ আমাকে ঠকাইও না। ইষ্টদেবতার নাম করিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং আদেশে দ্রব্যাদি দিতে লাগিল। এক বড় দোকানে সকল জিনিস একত্রিত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাবুর লোক দোকানে যাইয়া বলিল, হাজার টাকা করিয়া নোট আছে, গ্রহণ করুন, এবং দ্রব্যাদি নৌকায় চালান দিন। বাবু একটু অসুস্থ—শ্রাদ্ধের দিন নিকট, তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিবেন না। দোকানদারেরা বলিল, হাজার টাকার নোট আমরা গ্রহণ করিব না, তবে দ্রব্যাদি চালান দিই, বাবুর দেওয়ান কুণ্ডুদের বাড়ী গেলেই টাকা পাইবেন। কুণ্ডুদের বাড়ী ২০০০০্ টাকার জন্য দেওয়ান নোটসহ প্রেরিত হইল। এদিকে সমস্ত মাল নৌকায় বোঝাই হইলেই বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দোকানে দুই জন লোক এবং কুণ্ডুদের বাড়ী দেওয়ান ও একজন চাকর গিয়াছে। বজরা ছাড়িবার পূর্ব্বে দোকানদারদিগকে ডাকিয়া বাবু বলিলেন, টাকা আসিলেই আপনারা পাইবেন, লোক এবং দেওয়ান এই কাজের জন্য রহিল। আমার শরীর বড় কাতর হইতেছে, আমি নৌকা ছাড়ি। দেওয়ানকে ২০০০০্ টাকা ভাঙ্গাইতে দিয়াছি, যদি কুণ্ডুদের বাড়ী টাকা না পাওয়া যায়, কাল ঢাকা দেওয়ানের সহিত লোক পাঠাইবেন, সেখানে নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা দিবে। আপনাদের পাওয়ানা ১৫০০০্ মাত্র, আমি ২০০০০্ টাকার নোট রাখিয়া যাইতেছি। দেওয়ানের সহিত লোক রহিল না, সুতরাং নগদ ৫০০০্ টাকা নেওয়া তার পরে বড়ই বিপদজনক। সুতরাং নগদ টাকাটা আপনারা আমাকে আজ দিয়া দিন, কাল নোট ভাঙ্গান হইলে নিবেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে—দ্রব্যাদিও নৌকায় উঠিয়াছে, মাঝীরা পাল প্রস্তুত করিয়াছে। বাবুর অসুখ, বিলম্ব করিতেও

অনুরোধ করা যায় না। দ্রব্যাদি ফেরত লওয়াও অসম্ভব—এত ক্ষতি মহাজনদের স্বীকার করিতে কেন প্রবৃত্তি হইবে? এত লাভ কি সহজে ছাড়া যায়! অগত্যা মহাজনেরা পাঁচ ঘর হইতে ৫০০০্ টাকা দিয়া বাবুকে বিদায় করিল। কুণ্ডুদের আশায় পথ চাহিয়া দোকানীরা রহিল। বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পাল ভরে প্রবলবেগে দেখিতে দেখিতে ধলেশ্বরী অতিক্রম করিয়া বিশালবক্ষ মেঘনায় পড়িল। যথা সময়ে দেওয়ান মলিন মুখে দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কুণ্ডুদের বাড়ী টাকা পাওয়া গেল না!! দোকানদারেরা একটু বিমর্ষ হইল। কি করিবে, আর উপায় নাই। দেওয়ান ও লোকদিগকে যত্নপূর্ব্বক দোকানে রাখিল। পরদিন ঢাকার দেওয়ানের সহিত দুই জন বিশ্বাসী লোক প্রেরিত হইল। দেওয়ান পথের মধ্যে সেই লোক দুজনকে হত্যা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল এবং নৌকা অন্য পথ ধরিয়া চলিয়া গেল! যথা সময়ে লোক ফিরিতে না দেখিয়া দোকানদারেরা হাহাকার করিল! কিন্তু আর কি করিবে? কোথাকার লোক কোথায় গিয়াছে, কে জানে! শ্রীনাথ প্রথম বারেই এইরূপে ২০০০০ টাকার অধিকারী হইলেন।

বাসনার আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় বন্দর ঘুরিয়া ৪।৫ মাসের মধ্যে শ্রীনাথ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ কোন সংবাদ পত্র ছিল না;—দুই এক খান সামান্য সামান্য কাগজ থাকিলেও দোকানদারেরা তার বড় একটা ধার ধারে না। পুলিসের সহিত অবশ্যই শ্রীনাথের বন্দোবস্ত ছিল, নচেৎ কোন কোন স্থলে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পুলিস অর্থের পোষ্যপুত্র। যেমন টাকা দিবে, তেমন তোমার কাজ করিবে। টাকার প্রসাদে শ্রীনাথ পুলিসকে হাত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইলেন—দেখিতে দেখিতে এক বৎসরের মধ্যে লক্ষপতি হইলেন, শ্রীনাথ এখন বিষয়ের দিকে মনোযোগী হইলেন। কালেক্টারিতে দুই জন লোক নিযুক্ত করিলেন। সেকালে খাজনা না দিতে পারিলেই বিষয় নীলাম হইত। এখনও হয়। এইরূপ নীলাম ক্রয় করিয়া দেখিতে দেখিতে শ্রীনাথ একজন বড় ভূম্যধিকারী হইলেন। তাঁহার আর পূর্ব্ববঙ্গে থাকা পোষাইল না। তিনি এখন কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রীতিমত বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, আসবাব্ সব ক্রয় করিলেন। এদিকে জাল নোট চালা-

ইতে এবং দালালির ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিবিধ উপায়ে শ্রীনাথ কলিকাতার মধ্যে একজন বড় ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

এইরূপ হইতে যে খুব অধিক দিন লাগিয়াছে, তাহা নহে। দুই বৎসরের মধ্যে এরূপ হইয়াছে। দুই বৎসর বন্ধুত্রয় পৃথক হইয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে মিলনের কথা। কলিকাতা এবং বাঙ্গলার কত ধনী যে এইরূপ হঠাৎ উত্থিত, তাহার সংখ্যা নাই। গল্পটি উপন্যাসের ন্যায় বটে, কিন্তু এরূপ সত্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে। অধর্ম্মের সাহায্যে প্রতিদিন আমাদের চক্ষের সমক্ষে বড় বড় লোক গজাইতেছেন। এখনও দেখিতেছি, উপহারের ভেল্কিতে, বিজ্ঞাপনের ছটায় কত লোক বড়মানুষ হইতেছে। লবণের দালালী করিয়া ২ বৎসরের মধ্যে ১০লক্ষ টাকা পাইয়াছে, আমরা স্বয়ং এমন একজন বড়লোক দেখিয়াছি। শ্রীনাথের বুদ্ধির জোর, অদৃষ্ট প্রসন্ন—আজ সে রাজাধিরাজ,গণ্য মান্য ব্যক্তি। টাকায় টাকা আনে, টাকায় টাকা বাঁধে, এটা একটা প্রাচীন প্রবাদ। টাকায় টাকা আনিয়া শ্রীনাথের ঘর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

শ্রীনাথ এত দূর করিয়াছে, কিন্তু সে আজও বিবাহ করে নাই হিন্দুয়ানি বজায় রাখিতে সে ষোল আনা যত্ন করে। এখনও পূজ লয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণে দান এবং নানা সৎকাজের অনুষ্ঠান যথেষ্ট আছে। কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়া শ্রীনাথ লেখা পড়ায় খুব মনোযোগ দিলেন। রাশি রাশি পুস্তক কিনিয়া গৃহ সাজাইলেন। টাকার সাহায্যে বড় বড় লোক তাঁহার একান্ত বাধ্য হইল। শ্রীনাথ বাবু কলিকাতার মধ্যে এক জন ধনী, রিফরমার ও একজন সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া শ্রীনাথ ভাবিতেছেন, পৃথিবীর টাকার বাজার কি এতই সস্তা? পৃথিবীর লোকগুলি কি এতই মূর্খ? মেকি কি পৃথিবীতে এতই চলিতেছে? আমার ন্যায় লোকও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে?—ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—"এ দেশ ডুবিয়াছে।" শ্রীনাথ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাবিলেন, যে দেশে আমার ন্যায় ব্যক্তিকে হিতৈষী বলিয়া পূজা করে, সে দেশে আর মঙ্গল নাই। যে শ্রীনাথ নিজের ছবি দেখিয়া নিজেই লজ্জিত, সেই শ্রীনাথকে পাইয়া যে দেশের নরনারী গৌরব করে সে দেশের উন্নতি যে কত গভীর জলে নিমগ্ন, কে জানে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শঠে শঠে।

রূপে গুণে, ধনে মানে, শ্রীনাথ সকল বিষয়ে প্রশংসা পাইয়াছেন, সুতরাং শ্রীনাথের সহিত মেয়ে বিবাহ দিতে যে কলিকাতার অনেক লোকই লালায়িত হইবে, তাহাতে কিছু বিস্ময়ের কারণ নাই। ঘটকের দালালিতে শ্রীনাথ বাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বিবাহ করিব না, একথাও কাহাকে বলিতে পারেন না; করিব, একথাই বা কেমনে বলেন? মনের মধ্যে বাল্যকাল হইতে যে একটী বাসনাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কেমনে পরিত্যাগ করিবেন? শয়নে স্বপনে—যে দেবীর রূপ চিন্তা করিয়াছেন,—যাঁর জন্য জীবনে মৃত্যুকেও ভয় করেন নাই, তাঁহাকে ভুলিতে পারা সহজ কথা নয়। কলিকাতায় টাকার প্রলোভনের বল অনেক; একটী মেয়েকে বিবাহ করিলে হয় ত শ্রীনাথ হাজার টাকা পান, কিন্তু শ্রীনাথ ত টাকার ভিখারী নন্;—টাকার তাঁহার অভাব কি? তিনি ভাবেন, টাকার জন্য জীবনে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু পণ দিয়া, মূল্য দিয়া ভালবাসা ক্রয় করার চেয়ে আর কি কোন অধিক অধর্ম্মের কাজ আছে? ভালবাসিব কেবল ভালবাসার জন্য;—বিবাহ করিব কেবল বিবাহের জন্য;—টাকার জন্য কেন এস্থানে মজিব? এই জন্য ঘটকের জ্বালায় শ্রীনাথ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। শ্রীনাথের অর্থ-উপার্জ্জন-স্পৃহা, বড়লোক বলিয়া পরিচিত হওয়া, হরিদাসের উপকার করা, হরিদাসকে ভালবাসা—এ সকলেরই একটী গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। আজ পর্য্যন্ত শ্রীনাথ ভিন্ন তাহা কেহই জানে না। শ্রীনাথ এমনই চতুর। ধন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সহিত শ্রীনাথের বিলাসের দিকে খুব মনোনিবেশ হইয়াছে। ইহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। শ্রীনাথ সামান্য অবস্থাপন্ন লোক ছিল, তার পিতা মাতা দরিদ্র। কিন্তু তাঁহাদিগকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, আপনি নিজের সুখের জন্য, বিলাসের জন্য এখন যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ধন ঐশ্বর্য্য সহায় হইলে পৃথিবীতে পূর্ব্বের অবস্থার সমতা রক্ষা করিয়া পৃথিবীতে অতি অল্প লোক চলিতে পারে। দারিদ্র্যের অবস্থায় মোটা চাদর যার কত আদরের, ঐশ্বর্য্যের দিনে তার

কাশ্মীরি শাল ভিন্ন শরীরের শীত নিবারিত হয় না! সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন দুঃখের দিন যাহাদের পরম তৃপ্তির বস্তু, আদরের জিনিস, ঐশ্বর্য্যের দিনে পোলাও মাংস ভিন্ন তাহাদের রসনার তৃপ্তি হয় না! এজন্য পৃথিবীর মানুষকে যে দোষ দেয়, সে নিতান্ত মূর্খ! "ছিল না, করি নাই,—এখন আছে, বাবুগিরি করিব না কেন?" পৃথিবীর ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যখন এইরূপ কথা বলেন, তখন আর আশা কোথায়?

বিলাসের সহিত মানুষের ইন্দ্রিয়-তাড়না বৃদ্ধি পায়। বাহ্যরূপ, বাহ্য শোভার জন্য যে লালায়িত, ভিতরের সৌন্দর্য্যের প্রতি যে সে বীতস্পৃহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভিতরের সৎগুণ বিলাস-পরায়ণ লোকদিগের বড় একটা থাকে না। বিলাসের উপকরণ—রিপু-সেবা। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শ্রীনাথ দিন দিন কেমন হইয়া উঠিলেন। সোনাপুরের হীনাবস্থার কথা এখন আর স্মরণ নাই, পিতা মাতার দারিদ্র্য বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে, হরিদাসের ভালবাসা দূরে গিয়াছে—এত সাধের প্রতিজ্ঞা এখন বালকের ক্রীড়া বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন শ্রীনাথ বড়লোকের মধ্যে গণ্য, চাল্ চল্‌তি—ছোট খাট প্রতিজ্ঞার কথা এখন আর মনে থাকিবে কেন? এখন বড় বড় কাজ হাতে, রাজারাজড়ার সহিত মিলন, টাউন হলে বক্তৃতা, বড় বড় পলিটিকেল এজিটেসনে মন ব্যাপৃত, আর কোথায় তোমার সাধারণ শিক্ষা, দরিদ্রের উন্নতির কথা! এ সকল তবু সহ্য হয়। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শ্রীনাথ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের খাতিরে আজ কাল যে সকল পরিবারে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছেন, সে সব পরিবারের প্রতি এখন যেন কেমন কেমন ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন! এজন্য কোন কোন স্থলে তিরস্কৃতও হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে মাত্র, দোষ সংশোধেন প্রবৃত্তি জন্মে নাই। দোষ সংশোধনের প্রয়োজনই বা কি? পব্‌লিক ক্যার‍্যাক্‌টারের সহিত প্রাইবেট্ ক্যার‍্যাক্‌টারের কোন সম্বন্ধই নাই, দেশহিতৈষীরা বলেন। গোপনে তুমি মদ্যপান কর, ব্যভিচার কর, পাওয়ানাদারকে টাকা দেওনা, ভ্রমেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর না, মিথ্যা কথা বলা তোমার কণ্ঠের ভূষণ? তা হউক। তাতে কি আসিয়া যায়? বড় কথায় বক্তৃতা করিয়া পলিটিকেল এজিটেসন যদি করিতে পার, তবে আর চাই কি? অনায়াসে তুমি দিগ্বিজয়ী বলিয়া গণ্য হইবে, দেশব্যাপী সম্মানের অধিকারী হইবে! শ্রীনাথের জীবন তাহার জীবন্ত সাক্ষী। চন্দ্র সূর্য্য

সাক্ষী, উপরোক্ত সকল গুণে ভূষিত হইয়াও শ্রীনাথ দেশের পাওনিয়ার (পথ-প্রদর্শক) বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যার ভাগ্যে যা, কে তাহার প্রতিরোধ করে? শ্রীনাথের ভিতরের চরিত্রে বাহিরের কোনই অনিষ্ট হইল না। শ্রীনাথের নাম দেশ দেশান্তরে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল।

কাণকাটা দীননাথের সহিত এই সময়ে শ্রীনাথের পরিচয় হইল। উভয়ই কলিকাতাবাসী, উভয়ই দুষ্টমতি, উভয়ই প্রতিপত্তিশালী—ঘটনাক্রমে রত্ন রত্নের সহিত মিলিল।

দীননাথ কলিকাতা পৌঁছিয়া নাক কাণের চিকিৎসা করেন। উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে নাক কাণের ঘা আরাম হইয়াছে, কিন্তু আকৃতি অতি কুৎসিৎ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ হওয়ার কারণ কি লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে দীননাথ বলেন যে, "পরেশনাথের পথে ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম, ডাকাতেরা নাক কাণ কাটিয়া দিয়াছে।" কথাটা সত্য, কিন্তু ডাকাত আর কিছু না কাটিয়া নাক কাণ কাটিল কেন? একথা ভাঙ্গিয়া কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, সুতরাং দীননাথের পরিচয় দিতে অসত্য আচরণও করিতে হয় নাই। দীননাথের সহিত যখন শ্রীনাথের আলাপ হইল, তখন উভয়েই সুখী হইলেন।

দীননাথ এখন বিরহে কাতর, শ্রীনাথ এখন বিচ্ছেদে অধীর। কাহার কিসের বিরহ, কেহ জানেন না, কিন্তু দুইয়ের মনের অবস্থা যে একরূপ, তা উভয়েই বুঝিয়াছেন। দুই জনের মনেই ভণ্ডামি, চালাকি, ষোল আনা পরিমাণে বিদ্যমান, সুতরাং উভয়ের মধ্যে মিলনে তেমন জমাট বাঁধিল না, —কেমন ফাঁক ফাঁক বোধ হইতে লাগিল। শ্রীনাথ এখন বড়মানুষ, দীন নাথের তত টাকা নাই, ইহাই কি জমাট না বাঁধার কারণ, দীননাথ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। উভয়ের ইচ্ছা উভয়কে হাত করেন, কিন্তু কাহাকেও কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। উভয়ই সমান। ভাল চালাকির কিস্তি চলিয়াছে!

একদিন দীননাথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"শ্রীনাথবাবু, ধনী দরিদ্রে বন্ধুত্ব হওয়া বড়ই অসম্ভব,—না?

শ্রীনাথ।—ধনীর মন ও দরিদ্রের মন যদি একরূপ হয়, তবে হইবে না কেন?

দীননাথ।—তাও কি হতে পারে? কখনই না। একজনের মন ভাবে

টাকা, টাকা, টাকা। আর একজন ভাবে সুখ, সুখ, সুখ, কিসে মন একরূপ হবে? কিসে মিলন হবে?

শ্রীনাথ।—আর ঠাট্টার কাজ নেই? কথাটা কি, ভেঙ্গে বলনা ছাই?

দীননাথ।—এতদিন আপনার কাছে আনাগোনা কর্‌ছি, আজও আপনার মন পেলেম না? এই দুঃখ।

শ্রীনাথ।—মন দিয়াছ?

দীননাথ।—দেই নাই?—আমার মন প্রাণ সব ঢেলে দিয়াছি।

শ্রীনাথ।—কাকে? আমি সব বুঝি।

দীননাথ।—কেন, তোমাকে?

শ্রীনাথ।—আমাকে? তবে আর তোমার হৃদয় বিচ্ছেদে অধীর হ'ত না। আমি ত আছিই।

দীননাথ।—যা'ক, সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, ইচ্ছা হয়, তোমাকে মনের কথা বলি।

শ্রীনাথ।—বলই না কেন ছাই?

দীননাথ সরল প্রাণে আজ শ্রীনাথের কাছে মনের কথা সকল খুলিয়া বলিলেন। সোনাপুর, গঙ্গারামঠাকুরের বাড়ী, বলরামপুর, তারিণী চক্রবর্ত্তী, সেবা, সকলের কথা একে একে বলিলেন। সেবার কথা বলিবার সময় দীননাথের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, দীন নাথ বলিলেন, "ভাই, জীবনে আর তেমনটী পাইব না! সেবার নিকট শুনিয়াছি, স্বর্ণকলির ন্যায় মেয়ে সে আর কখনও দেখে নাই। স্বর্ণকলিকে পাইলে বুঝি বা সেবাকে ভুলিতে পারি! কি তাও কি ঘটিবে?!" বলিতে বলিতে দীননাথের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার বলিলেন—"ভাই, সেবাকে যে দিন দস্যুর হাতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম, সে দিন মৃত্যু হইলে আর কষ্ট ছিল না, কিন্তু এ অধমের জীবনে মৃত্যু নাই! আমি মরিলে কষ্ট পাইবে কে?"

শ্রীনাথ এতদিন পর দীননাথের মনের সকল কথা পাইলেন। সোনাপুর, বলরামপুরের কথা শুনিয়া কত কি মনে করিলেন! ইহাঁ হইতেই হরিদাসের যে কষ্ট আরম্ভ, ভাবিলেন। আরো কত কি ভাবিলেন, কে জানে? স্বর্ণকলির প্রতি ইহারও মন, ভাবিতে বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু সকল ভাব গোপন করিলেন। দীননাথ ভাবে গা ঢালিয়া দিয়াছে, প্রেমের স্রোতে পড়িয়াছে,—শ্রীনাথ

এখনও পা ঢালে নাই, সে তীব্র স্রোতে পড়ে নাই। সুতরাং মন ঢাকিতে শ্রীনাথের অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। শ্রীনাথ সংক্ষেপে বলিলেন, ভাই, দুঃখের দিন কাটিলেই সুখ পাইবে, কেন বৃথা রোদন কর?

দীননাথ বলিলেন, ভাই, তোমার কথা শুনিতে বড় সাধ, বলিবে না কি?

শ্রীনাথ।—বলিব; কিন্তু আজ না।

দীননাথ।—এই জন্যই ত বলি, তুমি বড় মানুষ, মনগুমরে—তোমার পেটের কথা পাওয়া দায়।

শ্রীনাথ বলিলেন, অনেক কথা বলিব, আজ সময় হইবে না। স্বর্ণলতাকে পাইলে যদি তুমি সুখী হও, তবে তাকে আন্‌তে যাওনা কেন?

দীননাথ।—অনেকবার সে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একবারও কৃতকার্য্য হই নাই। তিনি দেবী, তাঁর ধারে গেলে আমার বাক্‌রোধ হয়, আমি সকল কথা ভুলিয়া যাই, ইচ্ছা হয়, কেবল তাঁর পা দুখানি বক্ষে ধরিয়া পূজা করি।

শ্রীনাথ।—তিনি আজও জীবিতা আছেন?

দীননাথ।—তিনি অমর—কত কষ্ট তাঁর মস্তকের উপর দিয়া যাইতেছে, কিন্তু তার প্রসন্নতার হ্রাস নাই, রূপের বিকৃতি নাই, সাহসের বিরাম নাই, নির্ভরের শেষ নাই। তাঁর কথা আম কি আর বলিব, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি কখনও মরিবেন না।

শ্রীনাথ এতদিন পর স্বর্ণলতার কথা শুনিয়া বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দীননাথ অন্য কোন কথারই উত্তর করিলেন না। তাঁর দুনয়ন হইতে অবিরল ধারায় কেবল জল পড়িতে লাগিল, বাক্য ফুটিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বালবিধবা লীলার কথা।

আমরা দেখিলাম, তিন বন্ধুর মধ্যে শ্রীনাথ ও বলরামের দিন ভাল ভাবেই যাইতেছে। একজন ধনে মানে সর্ব্বপূজিত, একজন অসভ্যদের

মা বাপ। কেবল হরিদাসের মাথায় দারুণ দুঃখ কষ্টের বোঝা। শুনিয়াছি, ভাবুক ব্যক্তির জীবনের সম্বল কেবল নয়নের জল,—লোকের কষ্ট দেখা এবং অশ্রু ফেলা। যার কোন শক্তি নাই, বিধাতা তাঁহাকে প্রেমের দাস করিয়া কেন কষ্টের বোঝা মাথায় চাপাইয়া দেন? কে জানে, কেন!

সেই পুলিস কর্ম্মচারীর ঘরে হরিদাস প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভয়ানক দৃশ্য! দস্যুরা সব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, স্বামী স্ত্রীকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে, তাঁহারা মৃত্তিকায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন! রক্তের স্রোত নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। সেই স্রোত থামাইতে চেষ্টা করিতেছেন—এক মাত্র দুহিতা—লীলা। লীলার হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুলিসের লোক, পাড়ার লোক একত্রিত হইল। পুলিস এবং পাড়ার লোকের সন্দেহ হইল, নবাগত ব্যক্তিরই এই কাণ্ড। কিন্তু আহত ব্যক্তিদ্বয়ের অস্পষ্ট কথায় সকলে বুঝিল, হরিদাস সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; এবং ইহাও বুঝিল, হরিদাস দেশীয় বন্ধু। পুলিসের চেষ্টায় ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইল—চতুর্দ্দিকে ডাকাইত ধরিতে লোক নিযুক্ত হইল। হরিদাস জীবন ঢালিয়া স্বামী স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিশেষ অনুরোধে পুলিসের চেষ্টায় প্রথমতঃ গৃহেই চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত চলিল; হাঁসপাতালে চালান দেওয়া হইল না। লীলা দেখিল, পিতা মাতার অবস্থায় হরিদাস যাহা করিল, এরূপ মানুষ মানুষের জন্য করিতে পারে না। পথ্য প্রস্তুত করা, ঔষধ সেবন করান, মল মূত্র পরিষ্কার করা, এ সমস্তই হরিদাসের কার্য্য। হরিদাস এই বিপন্ন পরিবারের সাহায্যের জন্যই যেন জীবন ধারণ করিতেছিলেন, এই জন্যই যেন রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। বিধাতার লীলা কে বুঝিবে!

চিকিৎসা বা শুশ্রূষার ফল বড় ভাল হইল না—উভয়েরই ক্ষতস্থান ক্রমে বড় ভয়ানক আকার ধারণ করিল। অবশেষে পুলিস রোগীদিগকে হাঁসপাতালে চালান দিতে বাধ্য হইল। লীলা ও হরিদাস ভিন্ন আর আত্মীয় নাই, সুতরাং উভয়েই হাঁসপাতালে গেলেন। যত্ন ও সেবা রীতিমত চলিতে লাগিল। ঔষধাদির খুব জাঁকাল বন্দোবস্ত হইল। পুলিসের কর্ম্মচারীগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একে একে স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। লীলার আর কষ্টের সীমা রহিল না; পৃথিবীতে পিতা মাতা ভিন্ন লীলা আর কাহাকেও জানে না। চিরকাল বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানের পূর্ব্বেই

স্বামী বিয়োগ হইয়াছে। পিতামাতার আদরের ধন বড় সাধের লীলাকে কখনও শ্বশুর বাড়ীর ঘর করিতে হয় নাই। চিরকাল যেন সে দুঃখ পাইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! বঙ্গ বিধবার কষ্ট অপরিসীম। সেই কষ্টের ষোলকলা পূর্ণ করিবার জন্যই পিতা মাতা লীলার মমতা ছিঁড়িয়া পলায়ন করিলেন। বিধাতার ইচ্ছা কে খণ্ডন করিবে! মৃত্যুকালে লীলার পিতা কন্যাকে বলিলেন—"ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিও, ইহাঁরই হাতে তোমাকে সমর্পণ করিলাম। কখনও ইহাঁকে ছাড়িবে না।"

পুলিসকেও এই কথা বলিলেন। পিতার কর্ত্তব্য এই রূপে সম্পন্ন হইল। লীলার মাতা মৃত্যুকালে কিছুই বলিতে পারেন নাই, কেবল কয়েকবার "মা লীলা, মা লীলা" বলিয়া ডাকিযাছিলেন।

বাল বিধবার কষ্ট সর্ব্বপ্রকার। ঘরে অশান্তি, বাহিরে শত্রু। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন "গৃহীদের পক্ষে বিধবাদের এমন সুবিধার জিনিস এ পৃথিবীতে আর নাই, একাধারে রাঁধুণী, মেতরাণী, ও চাকরাণী—সকলই। সুতরাং ইহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনে লোকেরা কেন চেষ্টা করিবে! ঘরে ইহারা এইরূপ, আর কোন রূপে ঘরের বাহির করিতে পারিলে বিলাসের সামগ্রী, ইন্দ্রিয়-সেবার আরাম স্থান! কলিকাতার বেশ্যাদের তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি, প্রায় চৌদ্দ আনা বেশ্যা ভদ্র ঘরের বাল বিধবা! বলত, এমন সুখের জিনিসকে মানুষ ভাল করিতে কেন চেষ্টা করিবে? পুরুষের ন্যায় স্বার্থপর জীব কি আর আছে!" বাস্তবিক বাঙ্গলার বিধবার এইরূপ অবস্থা। গৃহে তাহারা চাকরাণী, রাঁধুনি, মেতরাণী, বাহিরে তাঁহারা কলঙ্কিনী, স্বৈরিণী! তাহাদের এ দুর্দ্দশা কে না দেখিতেছেন? বলপূর্ব্বক বালবিধবাদিগকে যে মহাত্মারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে বাধ্য করেন, তাঁহারা কি নিজের ব্যবহার, নিজের চরিত্র, নিজের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বিষয় একবারও ভাবিয়াছেন? ৬০ বৎসরের বিপত্নীক পুনঃ বিবাহের জন্য সদা লালায়িত, আর ১৩। ১৪ বৎসরের বালবিধবা সব সহ্য করিবে! এমন স্বেচ্ছাচারিতা আর কি কোন দেশে আছে? হা বঙ্গদেশ, তুই এখনও থাকিস্ কেন? তুই এখনও আছিস্ কেন? তুই শত শত ভণ্ড তর্কবাগীশ হিতৈষীর সহিত তোর কলঙ্কিত শরীর বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জন দে। নারীর দুর্দ্দশা যে দেশে, সে দেশ কেন থাকে? হায় হায়, লীলার পরিণাম কে ভাবিতে পারে? লীলা সবে এই যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন,—এই সময় কি ভয়ানক সময়!

এই আগুনের বোঝা অনেক সময় পিতা মাতার পক্ষে পর্য্যন্ত বহন করা কঠিন হইয়া উঠে, অন্যে কিরূপে বহিবে?

লীলা জীবনের এই দুর্দ্দম্য শঙ্কটের অবস্থায় অকূল সংসার-পাতারে ঝাপ দিতে বাধ্য হইলেন। সহায়—একমাত্র হরিদাস, কিন্তু হরিদাসও ত বিপদে ভাসিতেছেন। যার আপনার থাকিতে ঠাঁই নাই, তার উপর আবার কি বোঝা চাপিল! হরিদাসের সম্বলের মধ্যে কেবল চক্ষের জল! চক্ষের জল, তুই কি এই অসহায়দিগকে সংসারের পরপারে লইয়া যাইতে পারিবি?

পিতা মাতার মৃত্যুর পর লীলা ও হরিদাস হাঁসপাতাল হইতে লীলাদের সেই বাড়ীতে আসিলেন। গৃহের সর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনেও যথেষ্ট কষ্ট হইতে লাগিল। ইহার উপর পিতা মাতার শ্রাদ্ধ আছে। পিতামাতার প্রতি লীলার অবিচলিত ভক্তি, শ্রাদ্ধ না করিলে লীলার মন সুস্থ হইবে না। হরিদাস ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মন সাধারণতঃ বড় কঠোর, কিন্তু এই ঘটনায় সকলেই মুক্ত হস্তে দয়া করিল। চাঁদার তালিকায় অনেকে স্বাক্ষর করিলেন। সাধারণের দয়ায় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া একরূপ সমাধা হইল। এখন কি হইবে? হরিদাস বড় চিন্তিত হইলেন। লীলা শ্রাদ্ধের পর পিতা মাতার জন্য বড় অধীরা হইলেন। সেই বিষাদ-মাখা ঘরে থাকিলেই প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। এঘরে আর তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা নাই। লীলা বলিলেন—"এ ঘর বিক্রয় করিব!"

হরিদাস।—তার পর কি করিবে?

লীলা।—আপনার সঙ্গে যাইব।

হরিদাস।—আমি দরিদ্র, অসহায়, আমার সহিত কোথায় যাইবে?'

লীলা দৃঢ়তার সহিত তবুও বলিলেন, যে পথে আপনার ইচ্ছা। আমি বুঝিয়াছি, আপনাকে ছাড়িলেই আমার বিপদ ঘটিবে। চতুর্দ্দিকের লোক আমার প্রতি কুটিল চক্ষে তাকাইয়া আছে, এস্থল আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। এই জন্যই পিতা আপনার সঙ্গ ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি ত আপনাকে ছাড়িব না। এখন আপনার যা ইচ্ছা।

হরিদাস ভাবিয়া আর কূল পাইলেন না, ভিক্ষাজীবী হইয়া দিন কাটাইবেন, মনে করিলেন। বৃক্ষতলকে সম্বল করিয়া, লীলার ইচ্ছায় তাহাদের দুখানি ঘর বিক্রয় করিয়া লীলাকে লইয়া বাহির হইলেন। লীলা ও হরি-

দাসের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইল। কিন্তু সে বিষয় চিন্তা করার সময় নাই। দ্বারে দ্বারে গান করিয়া যাহা ভিক্ষা মিলিত, বৃক্ষতলে তাহাই রন্ধন করিয়া খাইতেন। সময়ে সময়ে রান্না ভাতও আবার অন্যকে দান করিতেন। লীলা ও হরিদাসের কষ্ট দেখিয়া বিড়াল কুকুরও চক্ষের জল ফেলিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী স্বর্ণকলি।

স্বর্ণকলিকে দুঃখিনী বলা ভাল হইতেছে কিনা, বুঝি না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, স্বর্ণকলি দুঃখিনী কিসে? যার জীবনের চতুর্দ্দিকে কেবলই বিপদ-সাগর দুঃখ-তরঙ্গ তুলিতেছে এবং যে সেই তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, তাঁহাকে সংসারের ভাষায় দুঃখিনী বলায় দোষ কি? এ প্রশ্নের উত্তর—সে দুঃখে স্বর্ণকলি কি লক্ষ্যভ্রষ্টা,—অস্থিরা—বিষণ্ণা? না—তাহা নয়। তবে কেন তাঁহাকে দুঃখিনী সম্বোধন? বাহিরের তরঙ্গ বাহিরে—স্বর্ণকলির হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না। তবুও কেন দুঃখিনী বলি? কেননা—অভিধানে আর উপযুক্ত শব্দ পাই না।

মাতৃহীনা স্বর্ণকলি, ভ্রাতাকে প্রাণের আবেগে, সত্যের খাতিরে, নির্ব্বাসিত করিলেন। ভ্রাতাকে জীবনের মত বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঘটনায় তাহা হইল না। সে সকল কথা পরে বলিব। এত সাধের দাদাকে বহিষ্কৃত করিয়া ভগ্নী কতক সুস্থচিত্ত হইলেন। কতকটা যেন শরীরের আগুন নির্ব্বাণ হইল। এই অবস্থায় ভাবিলেন,—এখন কি করিব? সন্ধ্যার পরও গৃহে আলো জ্বালিলেন না। দ্বার আবদ্ধ করিলেন। কিছু আহার করিলেন না। মা যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে বসিলেন। ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকের মহা আঁধার মুখব্যাদান করিয়া গৃহকে গ্রাস করিল। সেই অন্ধকারে, সেই শূন্য পুরীতে, সেই মাতৃশূন্য খাটে বসিয়া মাতৃহীনা ভক্তির সহিত গদ গদ চিত্তে সঙ্কীর্ত্তনের সুরে গাইতেছিলেন—

দয়া করে দাওহে দেখা, ওহে হরি হৃদ্‌বিহারি!
(ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী)

(পাপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী)
(আমি তোমা বই আর জানি না হে!)
(ছেড়ে যে'ও না, দেখা দেও হে হরি।)
(দেও হে দেখা প্রাণ সখা)

(আমি তোমার পায়ে ধরি, দেখা দেও হে হরি)
(দেখা দেও, দেখা দেও, দেখা দেও হে হরি,)
(তোমা ছেড়ে কোথা যাব, দেখা দেও হে হরি)
(তোমা বিনে কেহ নাই হে, দেখা দাও হে হরি।)

হরি হে, হরি হে, হরি হে, হরি হে।
সংসার-মহার্ণবে নইলে ডুবে মরি।
সংসার-পাপানলে নইলে পুড়ে মরি।
ছেড়ে যে'ও না, দেখা দেও হে হরি।

......র ভাবে, ততোধিক বিশ্বাসের ছটায় চতুর্দ্দিক যেন উজ্জ্বল হইল। আঁধার গৃহ যেন আর আঁধার নাই। সেই শূন্য গৃহ যেন আর শূন্য নাই। স্বর্ণকলি অনেক দিন সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভাব আর কখনও হয় নাই। তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, শরীর রোমাঞ্চিত—চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন স্বর্ণকলির অপরূপ জ্যোতি বাহির হইতেছে, স্বর্ণকলি সঙ্গীতান্তে শুনিলেন, কে যেন মনের মধ্যে স্পষ্টস্বরে কথা বলিতেছে, অভয় দান করিতেছে। যেন ঠিক শুনিলেন—"ভয় নাই, ধর্ম্ম ও চরিত্রই তোমাকে রক্ষা করিবে; কখনও এ দুই ছাড়া হই'ও না, তোমার ভয় নাই।"

স্বর্ণকলি এইরূপ কথা শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "কে কথা বল, স্পষ্ট দেখা দেও। দুঃখিনী বলে ঘৃণা না করে যদি কাছে এসেছ, নাথ, তোমার সুশীতল শ্রীচরণ, এই মলিন, এই শোকদগ্ধ বক্ষে স্থাপন কর। তোমার বংশীধ্বনিতে আমাকে মাতাইয়া, পাগল করিয়া তোল। আমি জন্মের মত তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই।"

এই সময়ে দ্বারে আঘাত হইল। স্বর্ণকলি ব্যস্ত হইলেন, ভাবোচ্ছ্বাস গোপন করিয়া দীপ জ্বালিলেন এবং বলিলেন, দ্বারে কে?

উত্তর হইল—রামানন্দ স্বামী।

স্বর্ণকলি দ্বার খুলিলেন। রামানন্দ স্বামীকে খাটের উপর বসিতে বলি-লেন এবং আপনি গৃহের কোণে মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন।

স্বামী বলিলেন—এরূপ ত আর কখনও কর না,আজ এত দূরে বসেছ কেন?

স্বর্ণকলি।—আজ হইতে এইরূপই বসিব। এখন একাকিনী, এখন একটু সাবধান থাকাই ভাল।

স্বামী।—আমাকে ভয় হইতেছে?

স্বর্ণকলি।—আপনাকে বলিয়া নহে। এইরূপ বসাই স্ত্রীলোকের পক্ষে সঙ্গত। এতদিন মা ছিলেন, দাদা ছিলেন, তখন একভাব ছিল, এখন আমার রক্ষাকর্ত্তা আমি আপনি, এখন একটু সাবধানে থাকাই ভাল।

স্বামী।—যা'ক, এখন তুমি কি করিবে, ভাবিতেছ?

স্বামী পূর্ব্বেই অন্যস্থানে সকল কথা শুনিয়াছিলেন।

স্বর্ণকলি।—আপনি কি করিতে বলেন?

স্বামী।—আমি কিছুই বুঝিতেছি না। এই গ্রামের কোন কোন লোক তোমাকে আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন।

স্বর্ণকলি বলিলেন, এই গ্রামে আমার এমন হিতকাঙ্ক্ষী আছেন? বলিতে বলিতে স্বর্ণকলির চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বামী বলিলেন, আছে বৈ কি।

স্বর্ণকলি।—এত দিন তাঁহারা সদয় হন নাই কেন।

স্বামী।—তাঁহারা বলেন, শক্রতা তোমার দাদার সঙ্গে ছিল, তিনি যখন গিয়াছেন, তখন আর কি?

স্বর্ণকলি।—আমি ও আমার দাদা কি পৃথক্! দাদা ও আমি একই -তিনি যান নাই—এই দেখুন—এখানেই বর্ত্তমান।

স্বামী স্বর্ণকলির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন।

স্বর্ণকলি আবার বলিলেন, আমার দাদা, আমার মা—এই আমার বুকের ভিতর সর্ব্বদা বিদ্যমান। পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি! আমি মা-হারা মেয়ে, দাদা-হারা বোন্ যে দিন হইব, সেই দিন অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন পৃথিবী ছাড়িব।

স্বর্ণকলির কথা শুনিয়া রামানন্দ স্বামীর মনের মধ্যে অনেক ভাব উপস্থিত হইল। কতক সংবরণ ও কতক গোপন করিয়া বলিলেন—"তোমার দাদার শক্র তবে তোমারও শক্র?"

স্বর্ণকলি হাসিয়া বলিলেন—"দাদার আবার শত্রু কে? এমন নূতন কথা আপনি কোথায় শুনিলেন? দাদা কি আপনাকে কখনও বলেছেন যে, তাহার শত্রু আছে? আমি বলিতেছি, আপনি শুনুন, এ পৃথিবীতে দাদার শত্রু নাই, আমারও শত্রু নাই। কে আমাদিগের কি অনিষ্ট করিয়াছে যে শত্রু হইবে?

স্বামী।—দাদার শত্রু নাই, তবে দাদা নরহত্যা করিলেন কেন?

স্বর্ণকলি।—ভাবের উত্তেজনায়, ক্রোধের তাড়নায়। আমার প্রতি কলঙ্ক আরোপ তাঁর অসহ্য হয়েছিল, সেই জন্য। তিনি কাহাকেও শত্রু মনে করিতেন না। আপনার পায়ে ধরি, দাদার চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করিবেন না।

স্বামী।—যা'ক, কথার কাটাকাটিতে প্রয়োজন নাই, তবে তুমি কোথাও যাবে না?

স্বর্ণকলি।—যাইব কেন? যাওয়ার প্রয়োজন কি? এতদিন ত আপনি এ কথা বলেন নাই, আজ বলিতেছেন কেন?

স্বামী মনে মনে একটু হাসিলেন, ভাবিলেন, বেশ্ লোককে শান্ত্বনা দিতে এসেছি। তার পর বলিলেন—কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই?

স্বর্ণকলি।—না হয় নাই। আমি সত্যই বলিতেছি, কোন ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সংসারের চক্ষে, অবিশ্বাসীর চক্ষে আমরা যে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, সে পরিবর্ত্তন কিছুই নয়। আমার মা আমার কাছে, এই বুকে, এই খাটে, ঐ শ্মশানের ভস্মে! আমার দাদা আমার এই সর্ব্বাঙ্গে। ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেই না সব পরিবর্ত্তন হয়? বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক হইয়াছি, এখন আমার মধ্যে কোনই ভাবের পরিবর্ত্তন নাই।

স্বামী।—তুমি অন্যত্র যাইবে না, তবে কে তোমাকে খাইতে দিবে? কে তোমাকে রক্ষা করিবে?

স্বর্ণকলি বলিলেন—যিনি এত দিন আহার দিতেন, যিনি এত দিন রক্ষা করিতেন, তিনিই আজও করিবেন, চিরকাল করিবেন। ঐ আকাশের পাখীকে যিনি খাওয়ান, বনের পশুকে যিনি রক্ষা করেন, তিনি কি আমাকে ভুলিয়া থাকিবেন? আমি শত অপরাধে অপরাধিনী হইলেও, তিনি আমাকে ভুলিবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বেশ থাকিতে পারিব।

রামানন্দ স্বামী স্বর্ণকলির বিশ্বাসপূর্ণ কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। আর কথা বলিলেন না। স্বর্ণকলিকে মনে মনে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আকাশ পৃথিবী সব যেন তাঁহার নিকট মধুময় বোধ হইতে লাগিল। নিজের প্রতারণাপূর্ণ সাধন ভজনকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ—স্বার্থের তাড়নায়।

মানুষ সাকার ও নিরাকার, দুইই ভালবাসে। সাকারের মধ্যে নিরাকার, নিরাকারের মধ্যে সাকার। এই দুই ভিন্ন মানুষ থাকিতে চায় না, থাকিতে ভালবাসে না। মানুষের শরীর সাকার, আত্মা নিরাকার। শরীর—শরীর চায়, অথবা সাকার ভালবাসে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা বা চরিতার্থতা চায়; আর আত্মা কেবল গুণ, কেবল সত্তা, কেবল সৎ বস্তু লইয়া থাকে, অর্থাৎ চিন্তা ও ধ্যান শক্তির বিকাশ চায়। যে বলে, সাকার ভুল, সেও মূর্খ। যে বলে নিরাকার কল্পনা, সেও মূর্খ। সাকারকে যদি ক্ষণকাল ভালবাসা যায়, তবে নিরাকারকে অনন্তকাল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত কাল ভালবাসা যায়। মানুষের মৃত্যুতে মানুষ ভালবাসা ভুলিতে পারিয়াছে, এমন কথা শুনি নাই। মানুষ জীবিত থাকা কালে ভালবাসিত জনের গুণ স্মরণ করে নাই, এমন লোকের কথাও শুনি নাই। সাকার ও নিরাকার দুইই প্রকৃতির নিয়ম। দুইয়েই জগতের শোভা। দুইয়েই মানুষের অবস্থিতি।

মানুষ যাহা পারে না, স্বর্ণকলি তাহা কেমনে পারিবেন? স্বর্ণকলি নিরাকার আত্মার চক্ষে মা ও দাদার সব গুণ দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর পরিতৃপ্তি হইতেছে না। পরিতৃপ্তি না হইলেই তিনি কেমনে ঠিক থাকিবেন? যে কারণে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি, সেই কারণ আজ স্বর্ণের হৃদয়ে উপস্থিত। স্বর্ণ পরদিন কুম্ভকার ডাকিয়া দাদা ও মায়ের ছবি নির্ম্মাণ করিলেন। রূপ ঠিক হইল না, কিন্তু ভাবের সহিত মিল হইল। দুই প্রতিমা হৃদয়ে ও বাহিরে—অন্তরে ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, সোনাপুরের গঙ্গারাম ঠাকুরের গৃহ দেবালয়ে পরিণত হইল।

স্বর্ণকলির মাথায় যে সুচিক্কণ গাঢ় কাল সুদীর্ঘ কেশরাশি ছিল, তাহা কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। পরিধানে সামান্য ধুতি। বিলাসের উপকরণও নাই, সে ইচ্ছাও নাই। কিন্তু সকল শোভা ত কেবল চুলে নয়?, যৌবনের ষোলকলা বিস্তার হইয়াছে—পূর্ণ চিত্র দেহ-দেবালয়ে প্রস্ফুটিত। কিন্তু সে রূপ কেবল বাহ্যরূপ নহে। স্বর্ণকলি মাতৃভক্ত ও ভ্রাতৃ-স্নেহের অবতার রূপে আজ সোনাপুরে অবতীর্ণা। দেখিতে দেখিতে স্বর্ণকলির প্রতি সোনাপুরের লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইল। সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিল, কি মহা ভুল করিয়াছিলাম! আজ কাল এমন অবস্থা হইয়াছে, যে সকল লোক ঠাট্টা করিতে আসে, তাহারা স্বর্ণকলির অপরূপ দেখিয়া নয়নকে সার্থক করিয়া চলিয়া যায়। লোক প্রতারণা করিতে আসে, কিন্তু দান করিয়া যায়। লোক কলুষিত ভাব লইয়া আগমন করে, স্বর্গের ভাবে অনু-প্রাণিত হইয়া ফিরিয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

গ্রামের যত রোগী, সব এই দেবালয়ে স্থান পাইয়াছে, পাড়ার যত অনাথ, অনাথা ছেলে মেয়ে সব ঐখানে আপনার গৃহ পাইয়াছে। দেশের যত ক্ষুধার্ত্ত—সব এখানে ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ পাইয়াছে। গঙ্গারাম ঠাকুরের বাড়ীতে কখনও অতিথি ফেরে নাই—আজও ফিরিতেছে না। দেশ দেশান্তর হইতে আগত শত শত লোক আহার পাইতেছে। এক মহোৎসবের ব্যাপার চলিয়াছে।

স্বর্ণকলি দিনান্তে একবার আহার করেন। সকলের আহার হইলে, সকল ক্ষুধার্ত্ত তৃপ্ত হইলে, স্বর্ণকলি অবশিষ্ট দ্রব্য তিন ভাগ করেন। এক ভাগ মাতার মূর্ত্তির সম্মুখে, এক ভাগ ভ্রাতার মূর্ত্তির সম্মুখে রাখেন, আর এক ভাগ নিজের জন্য রাখেন। তারপর ভক্তিচন্দন চর্চ্চিত পুষ্পে উভয়ের চরণ পূজা করেন এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন। তার পর ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিজের অংশ আহার করেন। দাদা বাড়ী থাকিতে, মা জীবিত থাকিতে গৃহের দ্রব্যাদি যেরূপ তিন জনের জন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইত, আজও সেইরূপ হইতেছে। দাদাকে না দিয়া, মাকে না দিয়া আহার করিতে নাই, ইহাই স্বর্ণকলির ধারণা। প্রত্যহ তিনি এইরূপ করেন। সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া কেহ উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু স্বর্ণকলির গৃহে দ্রব্য ধরে না। প্রাতঃকাল হইতে ক্রমাগত লোক আসিতেছে, লোক যাইতেছে। কে কোথা হইতে কি দিয়া যাইতেছে,

কে তার খোঁজ রাখে? যত দ্রব্যের আমদানি, সন্ধ্যার সময় সে সব জিনিসের সমাপ্তি। হিসাব নিকাশে কোনই গোল নাই। আসিতেছে, যাই- তেছে,—যেমন জমা হইতেছে—তেমনি খরচ হইতেছে। পরদিনের জন্ম কিছুই থাকে না। কোন জিনিস উদ্বৃত্ত হইলে সন্ধ্যার সময় স্বর্ণকলি গ্রামের লোক ডাকিয়া বিতরণ করেন, এ এক আশ্চর্য্য মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্বর্ণকলি একাকিনী রন্ধন, পরিবেশন, সেবা শুশ্রূষা—সকলই করিতেছেন। একটুও ক্লান্তি নাই, একটুও বিরক্তি নাই।

স্বর্ণকলি এখন সকলের প্রিয়, সকলের ভালবাসার পাত্রী হইয়াছেন, এইরূপ দেখিয়া রামানন্দ স্বামীর মনে বড়ই হিংসার উদ্রেক হইল। পূর্ব্বে তাঁহার আশ্রমে যে সকল লোক যাইত, এখন আর তাহারা সেখানে যায় না। পূর্ব্বে রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে যে সকল দ্রব্যাদি উপস্থিত হইত, এখন তাহাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। রামানন্দ স্বামী কাজেই স্বর্ণকলির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যিনি এক সময়ে পরম রক্ষক ছিলেন, তিনি এখন ভক্ষকের বেশ ধারণ করিলেন। মানুষের কাছে স্বার্থের ন্যায় আর মনোহর পদার্থ কি আছে? স্বার্থের অসাধ্য—কিছুই নাই। রামানন্দের প্রাণে দারুণ স্বার্থের বিষ প্রবেশ করিল।

রামানন্দ স্বামী নানাকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম কয়েক দিন বলিলেন—"যে নারী মানুষ পূজা করে, তার আবার একটা প্রশংসা কি? যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা অতিথি সৎকার করে, তার আবার একটা মহত্ত্ব কি?" এ কথার উত্তরে স্বর্ণকলির কোন কোন ভক্ত বলিত— "যে একজন মানুষকেও প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, তার ন্যায় আর কি লোক হয়?" বলিত—"মহত্ত্বের জন্য স্বর্ণকলি ত লালায়িত নন্। তাঁর ন্যায় রোগীর শুশ্রূষা, দীনের সেবা, শিশুর আদর—আর কে করিতে পারে, জানি না। আপনাকে যে পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁর সম্মান করিয়া সোনাপুর ধন্য হইতেছে।" এরূপ নিন্দাপ্রচারে সাধারণের ততটা সম্মতি না পাইয়া শেষে রামানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দশ দিন পূর্ব্বে যে কুলটা বলিয়া এদেশের সকলের ঘৃণার পাত্রী ছিল, কোন্ পরীক্ষার বলে আজ সে ধার্ম্মিকা বলিয়া পূজিতা হইতেছে?"

এ কথার উত্তরে এক সময়ে খুব যাহারা স্বর্ণকলির বিপক্ষ ছিল, তাহারা বলিল,—"দলাদলির উত্তেজনায় তখন ভুল বুঝিয়াছিলাম, এখন ভুল ধরা

পড়িয়াছে। কোন লোক প্রমাণ দিতে পারে যে, স্বর্ণকলি ধর্ম্মভ্রষ্টা?"

এইরূপ পূর্ব্ব চরিত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন সকলের মন ভাঙ্গিতে পারা গেল না, তখন রামানন্দ স্বামী স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই হতভাগিনীর দ্বারা সোনাপুরের ধর্ম্মকর্ম্ম সব লোপ পাইবে! ছোট ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত স্বর্ণকলি বিষাক্ত করিতেছে। আমি প্রমাণ করিব—ইহার চরিত্র কেবল বিষ ভরা,—ইহার ন্যায় চরিত্রহীনা নারী সোনাপুরে আর দ্বিতীয় নাই।"

এই স্পর্দ্ধার কথায় সাধারণের মন একটু নরম হইল। কেহ কেহ ভাবিতে লাগিল, স্বামীজি ত ইহার সকলই জানেন, বুঝি বা স্বর্ণকলি চরিত্রহীনাই হইবে!! এইরূপে নানা চক্রান্তে, নানা কুকথায় রামানন্দ অল্পে অল্পে লোকদিগকে একটু একটু বিরক্তির পথে লইয়া চলিলেন। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও স্বামী দিতে পারেন নাই। সেই প্রমাণের জন্য স্বামী বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। চক্রান্তের উপর চক্রান্ত—নানা চক্রান্ত, নানা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে! বুঝিবা স্বর্ণকলির চরিত্র-তরি এবার দুর্নাম-সাগরে নিমগ্ন হয়!!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মানবী—না দেবী?

স্বামীজীর চক্রান্ত বিবিধ। তিনি যে পথ পাইলেন, সেই পথ ধরিলেন। ভাল লোকের মতিচ্ছন্ন হইলে আর রক্ষার উপায় থাকে না। রামানন্দ স্বামী হিংসায় প্রপীড়িত হইয়া স্বর্ণকলিকে ডুবাইবার জন্য বিবিধ উপায় আবিষ্কার করিলেন। যে রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে আর রাখে কে? স্বর্ণকলির জীবনের বিরুদ্ধে—চিরকাল ঘোর সংগ্রাম লাগিয়া রহিয়াছে! হায়, হায়, কোন সহায় নাই, কোন আশ্রয় নাই! তবে বুঝি স্বর্ণকলি এবার ভাসিয়া যায়!!

এক কাণকাটা সন্ন্যাসী কয়েকদিন আসিয়া স্বর্ণকলির আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। সন্ন্যাসী বলে, সে বহুদূর হইতে এই আশ্রমের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া আসিয়াছে। কার মনে কি অভিসন্ধি আছে, স্বর্ণকলির তাহা ভাবিবার সময়

নাই, একই ভাবে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেছেন, যে আসিতেছে, তাহাকেই স্থান দিতে্ছেন। বহুদিনের পরিচিত, নূতন পরিচিত —সকলই সমান। সন্ন্যাসীর প্রতি স্বর্ণকলির যত্নের ত্রুটী নাই। কিন্তু তার মন বড়ই বিকৃত;—একদিন একটু সময় পাইয়া স্বর্ণকলিকে বলিতেছে—"তোমাকে পাইলে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়, চল আমরা, সোনাপুর হইতে পলায়ন করি। এখানে রামানন্দ স্বামীর দৌরাত্ম্য, এখানে থাকিলে বড়ই অমঙ্গল ঘটিবে। চল যাই, চল পালাই।"

স্বর্ণকলি।—পালাইব কেন ? কার ভয়ে ?

সন্ন্যাসী।—রামানন্দ স্বামীকে সামান্য লোক ভাবিতেছ ?—সে তোমাকে ডুবাইবে !

স্বর্ণকলি।—ডুবিবার হই, ডুবিব। তবুও শেষ না দেখিয়া মাতৃধাম অন্যে পরিত্যাগ করিব না। মাতৃধাম পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নিরাপদ স্থান। আমার শরীর এই মাটীতেই মিশাইব, এই ইচ্ছা।

সন্ন্যাসী স্বর্ণকলির নিকটস্থ হইল, স্বর্ণের হাত ধরিল, মিনতি করিল, পা ধরিল, কিন্তু কিছুতেই স্বর্ণের মন টলিল না। সন্ন্যাসী বড়ই বিরক্ত হইল। রাত্রে আবার স্বর্ণকলিকে আক্রমণ করিল। পাশব ব্যবহারের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল ! কিন্তু স্বর্ণকলি অবিচলিতা, বলিলেন, আপনি আমার পিতার ন্যায়, আপনার এইরূপ ব্যবহার ! ছি, সাবধান হউন।

সংন্যাসী একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু বিকৃত মন সুস্থ হইল না। রাত্রে গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিল এবং গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। তার পর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিল, ব্যভিচার করিয়া এখন স্বর্ণকলি আত্মঘাতিনী হইতেছেন। এই কথা ঘোষণা করিয়াই আপনি পলায়ন করিল।

সেই রজনী কি ভয়ানক রজনী ! স্বর্ণকলি ঘুমে অচেতন, এমন সময়ে মাথার উপর লক্ লক্ ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদিগের দুর্দ্দশা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। হঠাৎ জাগরিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন এবং চিৎকার করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকের লোক সাহায্যার্থ আগমন করিল বটে; কিন্তু প্রাণ দিয়া প্রাণ রাখিতে পারে কয় জন ব্যক্তি ? স্বর্ণকলি দেখিলেন, লোকেরা চতুর্দ্দিক হইতে তামাসা দেখিতেছে, কেহ কেহ সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিবার

চেষ্টায় আছে ;—অতি অল্প লোক বিপন্নদের সাহায্যে তৎপর। স্বর্ণকলি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। কোমর বাঁধিলেন—এবং একে একে রোগীদিগকে ঘরের বাহির করিতে লাগিলেন। দশজনের সাহায্যে আশ্রমের যে অপরূপ শোভা হইয়াছিল, সে শোভা নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল। আগুনের হল্কায় স্বর্ণের সর্ব্বাঙ্গ কালীময় হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীরে ফোস্কা পড়িল। কিন্তু তবুও বিশ্রাম নাই !! যখন একজন একজন করিয়া লোক গণিয়া দেখিলেন, সকল রোগী বাহির হইয়াছে, তখন মনে পড়িল—মা ও দাদার মূর্ত্তি বাহির হয় নাই !! পিতা মাতার স্মৃতিচিহ্ন সেই ঘরেই ছিল—তাহা পুড়িয়া ভস্ম হইতে লাগিল !! স্বর্ণকলির প্রাণে এই বার বড় ব্যথা লাগিল। এই আগুনের মধ্যে এই বার তিনি ঝাঁপ দিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু কে যেন বলিল, "কর কি, লোকে যে সত্যই তাহা হইলে তোমাকে দুশ্চরিত্রা বলিবে। আত্মহত্যা মহা পাপ।" স্বর্ণকলি চকিতা হইলেন, কে কথা বলিল, বুঝিলেন না, কিন্তু কথাটা প্রাণে বড়ই লাগিল। ইতিমধ্যে কয়েক জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং পা ধরিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল,—"দেবি, ক্ষান্ত হউন, আমাদের মা বাপ সকলই আপনি, আমাদিগকে চিরকালের তরে ডুবাইবেন না।"

স্বর্ণকলির ভাবের উচ্ছ্বাস একটু থামিল, নিজের দায়িত্ব বুঝিলেন। বুঝিলেন, এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। লোকের চরিত্রের শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। তারপর স্বর্ণকলি এক গৃহস্থের বাড়ীতে নীতা হইলেন। আশ্রমের সমস্ত জিনিস পুড়িয়া ভস্ম হইল! ভবের খেলা, এইরূপই সাঙ্গ হয়।

পরদিন গ্রামে অনেক কথা রাষ্ট্র হইল। রামানন্দ স্বামী রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, "পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বর্ণকলির এই চেষ্টা।" রাষ্ট্র হইল, "যে সন্ন্যাসী আশ্রমে ছিল, তার সহিত স্বর্ণকলির চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। সে পলায়ন করিয়াছে, ইনি প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন।"

কথাটা শুনিয়া লোকের মনে একটু একটু সন্দেহ হইল। একে স্ত্রীলোক, তাতে যুবতী,—পতন অসম্ভবই বা কি? কত শত শত লোকের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতেছে, কত দেবতার পতন হইতেছে, স্বর্ণকলির পতন হইবে, আশ্চর্য্য কি! কেহ কেহ এইরূপ বলিল। কেহ কেহ এ কথা মোটেই বিশ্বাস করিল না। বিশ্বনাথ রায় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি পেন্সন লইয়া এখন দেশে আসিয়া

বাস করিতেছিলেন। ছেলের শোকে তিনি অস্থির। গৃহ হইতে প্রায় বাহির হইতেন না। কিন্তু এই ভয়ানক রজনীতে ঘরের বাহির হইয়া সকল দেখিয়াছেন। তিনিই স্বর্ণকলিকে মরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরদিন গ্রামে যখন নানারূপ অপবাদের কথা ঘোষিত হইল, তখন তিনি তাহার গতি থামাইতে চেষ্টা করিলেন। সন্ন্যাসী তখন পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। পুলিসে সংবাদ দিলেন যে, সন্ন্যাসী সমস্ত দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিস বনে বনে, গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ রায় ধনী ব্যক্তি, এজন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিলেন। ব্যাপারটা একটু জাঁকিয়া উঠিল। রামানন্দ স্বামী একদিকে, বিশ্বনাথ রায় অন্য দিকে। সমানে সমান। কোন্ পক্ষের জয় হইবে, ক্ষণকাল লোকদিগের সন্দেহ জন্মিল।

বিশ্বনাথ রায় স্বর্ণকলিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে যথেষ্ট যত্ন করিলেন। "মা, আমার মেয়ে নাই, তুমিই আমার মেয়ে, ঘরে এস সুখে থাক। তোমার প্রতি লোকেরা একাল পর্য্যন্ত যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার শেষ নাই। মা তুমি আর কতদিন এইরূপ কষ্ট সহ্য করিবে? তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়!

স্বর্ণকলি বিশ্বনাথ রায়কে চিরকাল শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনায় প্রীতি লাভ করিয়া বলিলেন—"পিত, আপনি আমাকে মেয়ের ন্যায় দেখেন, জানি। কিন্তু আমি আর ঘরে যাইব না। হরির ইচ্ছা, আমি আর গৃহে না থাকি! এই জন্যই এইরূপ হইয়াছে। দাদাকে যতদিন না পাইব ততদিন বৃক্ষতলই আমায় শান্তি দিবে। মায়ের শ্মশানের বটবৃক্ষের ছায়া এ জীবনের পরম আরাম স্থল! আপনি বৃথা আর অনুরোধ করিবেন না;—আমি আর বাড়ীতে যাইব না।

বিশ্বনাথ রায় বলিলেন—তবে পূর্ব্বের ন্যায় তোমার আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দি না কেন?

স্বর্ণকলি।—আমি আর আশ্রমে থাকিব না, তবে রোগীর জন্য, অতিথির জন্য আপনি দুই খানি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিন।

বিশ্বনাথ রায় তাহাই করিলেন। স্বর্ণকলির গায়ের ফোস্কা ফুটিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর ঔষধ দিতেন না। হরির নাম করিয়া সর্ব্বদেহে কেবল চরণামৃত প্রলেপ দিতেন। পোড়ার ঘায়ের দারুণ

কষ্ট, রাত্রে নিদ্রা নাই, তবুও স্বর্ণকলির মুখ প্রসন্ন। কি এক স্বর্গীয় শোভা ঐ ক্ষত দেহের ভিতর দিয়া অবিরাম যেন বাহির হইতেছে।

পুলিসের চেষ্টায় কয়েকদিনেব মধ্যে দ্রব্যাদি সহ সন্ন্যাসী ধৃত হইয়া সোনাপুরে আনীত হইলেন। কাণকাটা লোকটার প্রতি সকল লোকেরই সন্দেহ হইল। পুলিসের মনে আর দ্বিধা নাই। সকলেই বুঝিল, এই ব্যক্তিই আশ্রমে আগুন দিয়াছে!

সন্ন্যাসীর মুখ তত মলিন নহে। সে বলিতেছে, স্বর্ণকলির চরিত্র খারাপ। আমাকে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ দ্রব্যাদি দান করিয়াছে এবং আমাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনি ঘরে আগুন দিয়াছে। কিন্তু কথাটা লোকের মনে তত ধরিতেছে না।

রামানন্দ স্বামী বলিতেছেন—ইহাপেক্ষা আর জীবন্ত প্রমাণ কি চাই, হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছে। সোনাপুর স্বামীর আস্ফালন ও অভিমানে পরিপূর্ণ হইল। তিনি সাহঙ্কারে চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন "মেকি ধরা পড়িয়াছে, স্বর্ণকলির মুখে ছাই দেও, কলঙ্কে সোনাপুর ডুবিয়াছে।"

পুলিসের লোক দ্রব্যসহ সন্ন্যাসীকে লইয়া স্বর্ণকলির নিকট উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ রায় সঙ্গে সঙ্গে আছেন। স্বর্ণকলির দারুণ বেদনা। এই সময়ে বহুলোক উপস্থিত দেখিয়া তিনি বলিলেন, কি হয়েছে, এত ভিড় কেন?

পুলিসের লোক উত্তর করিল, এই সন্ন্যাসী আপনার দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিতেছিল বলিয়া ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি, আপনি ইহাকে জানেন? এই দ্রব্যাদি কি আপনার?

স্বর্ণকলি।—ইহাকে জানি, ইনি কয়েক দিন আমাদের আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যিনি অতিথি, তিনি দেবতা। ইহাকে আপনারা ধরিয়া আনিয়াছেন কেন? ছাড়িয়া দিন। ইনি বড় কষ্ট পাইয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছিলেন, মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় বাড়ী যাইতেছিলেন। ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

পুলিস্।—লোকেরা সাক্ষী দিতেছে, ইনি আপনার অনিষ্টের জন্য আশ্রমে আগুন দিয়াছেন, এবং আপনার এই সকল দ্রব্য চুরি করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, এই সকল দ্রব্য আপনি ভালবাসার খাতিরে ইহাকে দিয়াছেন! কোন্ কথা সত্য?

স্বর্ণকলি বলিলেন—ইনি যে আমার অনিষ্ট করিতে পারেন, আমি তাহা মনে করি না। ইনি যে গৃহে আগুন দিয়াছেন, তাহাও বলিতে পারি না। আর দিলেনই বা, আশ্রমেব প্রতি আমার একটা আসক্তি ছিল, তাহা নির্ম্মূল করিয়া ইনি পরম বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার অপরাধ কি ? এই সকল দ্রব্যাদি আশ্রমেব—আমার নহে। আশ্রমের দ্রব্যাদিতে আশ্রম-বাসী সকলের সমান অধিকার। ইনি আশ্রমবাসী, সুতরাং নিজের জিনিসই গ্রহণ করিয়াছেন, তাতে ইহার অপরাধ কি ? আপনাদিগকে মিনতি করি, ইঁহাকে ছাড়িয়া দিন।"

"সন্ন্যাসীর প্রতি স্বর্ণকলির এত দয়া কেন ?"—অনেক লোক সন্দেহযুক্ত ভাষায় এইরূপ বলাবলি কবিতে লাগিল।

বিশ্বনাথ রায় আর সহ্য করিতে না পাবিয়া বলিলেন,—"মা, ইনি তোমার নিষ্কলঙ্ক স্বভাবে দোষ দিতেছেন; কেমনে ইহাকে অমনি ছাড়িয়া দিব ?"

স্বর্ণকলি বলিলেন,—পিতঃ, জানেন না কি যে, আমি মহা অপরাধিনী! নির্দ্দোষী, নিষ্পাপী এ জগতে কোথায় পাইবেন ? আপনার এ কন্যা, এ দাসী পাপের অনন্ত কূপে নিমগ্না! তাহা কি আপনি জানেন না ? আমি অস্পৃশ্যা—আমার জন্য এত করেন কেন ? পায়ে ধরি, ইঁহাকে আর কষ্ট দিবেন না, ছাড়িয়া দিন।

বিশ্বনাথ রাব স্বর্ণকলির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। তবে কি রামানন্দ স্বামীর কথা সত্য ? ক্ষণকাল এই কথা ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, "মা, ইনি বলেন, তুমি ইঁহার সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছ! এ কথা কি সত্য ?"

স্বর্ণকলি গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হইয়াছে ? এ কথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন ?

বিশ্বনাথ রায়ের মন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, তোমার প্রতি সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু ইনি এইরূপ বলেন।

স্বর্ণকলি বলিলেন, ইনি বলেন ?

এই কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে স্বর্ণকলি বলিলেন যে, সকলের হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের ন্যায় কথাটা প্রবেশ করিল। স্বর্ণকলিব অপরাজিত দয়ার পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসী অবাক হইতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন,—"এমন দেবকন্যার প্রতি এইরূপ জঘন্য ব্যবহার করিয়াছি, ছি, এ জীবন রাখিতে নাই!—আমার ন্যায় নরাধম আর কি আছে ?" এইরূপ ভাবিতেছিলেন.

এমন সময়ে স্বর্ণকলির মধুরভাষার প্রশ্ন "ইনি বলেন ?" এই কথা প্রাণে পৌঁছিল; সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষু হইতে দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

স্বর্ণকলি পুনঃ বলিলেন—"ইনি বলেন ? আমার বিবেচনায় তাহা অসম্ভব। ইনি ত এই সম্মুখে আছেন, আমার সম্মুখে ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন ;—আমার নিকট এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কেন ? হরি এই করুন, অতিথির বিরুদ্ধে যেন আমাকে কখনও কোন কথা বলিতে না হয়! কতবার আপনাকে বলিয়াছি, আমার একটিও শত্রু নাই ;—তবুও বিশ্বাস করেন না, আমি আর কি করিব ?"

স্বর্ণকলির নয়ন হইতে মৃদু মৃদু ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল।

এইবার সন্ন্যাসীর উত্তর দিবার সময়। সন্ন্যাসী আর নীরব থাকিতে পারিল না। সকল লোক, পুলিসের কর্ম্মচারী, বিশ্বনাথ রায়, সন্ন্যাসীর উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য। রামানন্দ তীর্থস্বামীও এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা করিল না,—তাহার সর্ব্বশরীর দিয়া যেন কেমন এক স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল, বলিল—"আমি নরাধম, ইনি দেবী। আমি রিপুর উত্তেজনায় ইঁহার উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইঁহার মন বিচলিত হইতে দেখি নাই! বিফল-মনোরথ হইয়া আমি দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া আশ্রমে আগুন দিয়াছি। আমার ন্যায় নরাধম আর জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি চিরকালের জন্য ডুবিয়াছি। এখন কারাগারই আমার জীবনের পক্ষে একমাত্র আরাম স্থল। আপনারা সকলে চেষ্টা করিয়া আমাকে কারাগারে দিন।"

তারপর সন্ন্যাসী পুলিসকে বলিল,—"ভাই, তোমাদের পায়ে ধরি, আমাকে যত শাস্তি থাকে দেও, আমাকে পায়ে মাড়াও—আমার ন্যায় নরাধম আর নাই!"

সন্ন্যাসীর এইরূপ বিষাদপূর্ণ আত্মনিবেদনে সকল লোক স্তম্ভিত হইল। রামানন্দ স্বামীর দর্প চূর্ণ হইল, মুখে কালি পড়িল। পুলিস কি করিবে, ভাবিতে লাগিল। এই সময়ে স্বর্ণকলি পুনরায় পুলিসকে সম্বোধন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"যে অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে, সে দেবতা। তাহাকে ক্ষমা করার ব্যবস্থা কি আইনে নাই ?"

পুলিস উত্তর করিল,—না—তেমন ব্যবস্থা নাই।

স্বর্ণকলি একটু বিরক্ত হইলেন, এবং ভাবিলেন—এমন আইন কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত! তারপর বলিলেন, "আপনাদের চরণে আমার একমাত্র নিবেদন এই, ইহাকে ছাড়িয়া দিন।" বিশ্বনাথ রায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—পিতঃ, পায়ে ধরি, ইহার বিরুদ্ধে আর চলিবেন না।

দেবী স্বর্ণকলির অনুরোধ প্রতিপালিত হইল, দ্রব্যাদি সহ সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সোনাপুর পরিত্যাগ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণকলির নিবেদন।

দিনে দিনে স্বর্ণকলি সুস্থ হইলেন। তিনি এখন মাতৃশ্মশানে রাত্রে বাস করেন, সমস্ত দিন অতিথিসেবা ও রোগীর শুশ্রূষা করেন। আশ্রমের উন্মুক্তদ্বার—লোকে লোকারণ্য। সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ আসা যাওয়া করে। আবার স্বর্ণকলির নামের প্রশংসার স্তুতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

রামানন্দ স্বামীর মুখে কালি পড়িল, কিন্তু তবুও নির্লজ্জের ন্যায় তিনি আপন পথ পরিত্যাগ করিলেন না। স্বার্থের পথে কেহ কণ্টক রোপণ করিলে লোক সাধারণতঃ এইরূপই বিরোধী হয়। এ ছাড়া স্বামীর মনে বরাবর এক দুরভিসন্ধি ছিল। স্বর্ণকলিকে স্বামীজী অল্পে ছাড়িলেন না। ইহার পর গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন, "কাজের ধূয়া ধরিয়া, দরিদ্রের উপকারের ছলনায় যে সে লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য ঘর ছাড়িয়া স্বর্ণকলি উন্মুক্ত শ্মশানের আশ্রয় লইয়াছে।" আরো বলিলেন, "কাজ ও ধর্ম্ম—দুই বিরোধী জিনিস। ধর্ম্মের সহিত কাজের কোন সম্বন্ধই নাই,—প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত যোগে কাজ কর্ম্ম নাই;—সেবা নাই; ধর্ম্মে কেবল সমাধি, কেবল উপভোগের অবস্থা।" একথায় কেহ কেহ বলিল, "স্বর্ণকলি কি বলিয়াছেন যে,

তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান কবিতেছেন ?" উত্তরে স্বামী বলেন, "ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, তবে তার চবিত্র থাকিবে কিরূপে ? ধর্ম্মহীন লোক চরিত্রহীন !"

এইরূপ নিন্দা-প্রচার ভিন্ন রামানন্দ স্বামী আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেন। সে অতি ঘৃণিত কাজ। বলিতে লজ্জা হয়, না বলিলেও নয়। তাঁহার ধর্ম্মজটার ভিতর কত ভয়ঙ্কর বিষধর লুক্কায়িত ছিল, পাঠক একবার দেখুন।

কাহারও প্রতি স্বর্ণকলির অনুবাগ বা বিবাগ নাই—কাহারও প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ নাই। যে আসে তার সহিতই সমান ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন; কিন্তু প্রাণান্তেও কাহাব নিকটস্থ হন না। মনে—স্বর্ণকলি সকলের অতি নিকটে ; বাহিবে—পুরুষমাত্র হইতে বহুদূবে। মাতৃবিয়োগের পব এইটি স্বর্ণকলির চরিত্রের বিশেষ ভাব। সে যাউক, অবান্তরিক কথার প্রয়োজন নাই। একদিন রামানন্দ স্বামীব সহিত স্বর্ণকলিব এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়।

রামানন্দ।—তুমি বল, কাজেব ভিতরেই যোগ, যোগেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মেই চরিত্র, চরিত্রেই মনুষ্যত্ব। একথা কিরূপে স্বীকাব করা যায় ? জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম,—শরীর—এ সকল কি ধর্ম্মের কিছুই নয় ? কর্ম্মেই যদি লোক ব্যাপৃত রহিল, তবে কখন লোক যোগ করিবে, কখন প্রেমভক্তি সাধন করিবে, কখন লোক জ্ঞান চর্চ্চা করিবে ?

স্বর্ণকলি বলিলেন.—জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম,—শবীব—এ সকলই ধর্ম্মেব অনুকূল, কিন্তু কর্ম্ম বা সেবা ভিন্ন এ সকলই বৃথা। সংসাবে সেবাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, কিন্তু নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত সেবাই মানুষকে ধর্ম্ম ও চরিত্রের পথে লইয়া যাইতে পারে, নচেৎ সাংসারিকতা আসিয়া মানুষকে নিমগ্ন করে। মানুষ যদি কাজ না করিবে, তবে এই যে হস্তপদ বিশিষ্ট দেহ, এ সকলকে বিধাতা কি বৃথা সৃজন করিয়াছেন ?

রামানন্দ।—মানুষ যদি দিবারাত্রি সেবাতেই ব্যাপৃত থাকিবে, তবে যোগসাধন করিবে কখন ?

স্বর্ণকলি।—সেবাতেই যোগ, সেবাতেই প্রেম, সেবাতেই মুক্তি। শুধু কল্পনা বা আঁধারের পূজাতে যোগ, প্রেম বা জ্ঞান সাধন হয় না। কাজ কাহার ?—লীলা রসময় হরির। জগৎ তাঁহারই, জীব জন্তু তাঁহারই—সকল মহিমা তাঁহারই ! তাঁহার সৃষ্ট জীবজন্তুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেই তাঁহাকে ভালবাসা হয়,—তাঁহার সহবাসে থাকা হয় ; কেননা, তিনি তাঁহার সৃষ্টি

হইতে অভিন্ন। সাকার অবলম্বন ভিন্ন জ্ঞান কিসে হইবে?—দেহধারী মানুষের ভিতর হরি অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সৃজন করিয়াছেন—তাহা আজীবন অধ্যয়ন করিলেও শেষ হয় না। পুস্তক পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অবিশ্বাসপূর্ণ জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃতি-পাঠে জন্মে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ,—ইহাঁরা সকলেই প্রকৃতির শিষ্য ছিলেন, সকলেই সেবাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তাঁহারা পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্ব-পরিবারের সহিত ঘনীভূত প্রেমে সংযুক্ত হইয়া জগতের জন্য প্রাণ দিয়া গিয়াছেন। যে বলে কর্ম্মে ধর্ম্ম নাই, সে ধর্ম্মের অর্থ আজও বুঝে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনাসক্ত সেবাই মুক্তি। সেবা ভিন্ন মানুষের রিপুর যন্ত্রণা কমে না; অন্যের জন্য শরীর পাত না করিলে বৈকুণ্ঠ মিলে না। মন হরির ধ্যানের জন্য,—এই শরীর হরির সেবার জন্য। সৃষ্টির সেবাই হরির সেবা। আপনি কি বলেন?

রামানন্দ।—কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সংসার-সেবাতে মানুষ যে আরো আসক্তিতে ডুবিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না?

স্বর্ণকলি।—দেখিতেছি, কিন্তু তার আর উপায় নাই। প্রকৃত বিশ্বাস নাই বলিয়াই এরূপ হইতেছে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারের অতীতকে মানুষ ধরিতে পারিবে—তখন আর এই বাহ্য আসক্তি থাকিবে না। সংসারে থাকিয়া মানুষ মজিয়াছে, আপনি বলেন; কিন্তু কত 'গৈরিকধারী অরণ্যবাসী লোক যে গৈরিক ও অরণ্যের আসক্তিতে ডুবিয়াছে, আপনি কি তাহা জানেন না? মনোরাজ্যে যে বিজয়ী, কোথাও তার ভয় নাই। প্রকৃত বিশ্বাসী ভিন্ন এই জয়লাভে কেহই অধিকারী নয়। সংসারও যাঁহার, অরণ্যও তাঁহারই। বিশ্বাসী ব্যক্তি সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখেন।

রামানন্দ।—এক সময়ে যোগ ও সেবা কি সম্ভব?

স্বর্ণকলি।—সম্ভব। মনে করুন, আপনি একটি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। ভ্রমণ হইতেছে, কিন্তু মনের গতি অন্য দিকে থাকায় সে ভ্রমণের কোন ধারণা নাই। এরূপ অনেক সময় দেখিয়া থাকিবেন। যাঁহারা মন তাঁতে নিবদ্ধ রাখিয়া কাজ করেন, তাঁহারাই অনাসক্ত কর্ম্মের অধিকারী। তাঁহারা কর্ম্ম করেন, কিন্তু মন কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সদা হরির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। "হাতে কাজ, মন তাঁতে" একথা যাঁর জীবনে সফল হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম অতি সুলভ।

রামানন্দ।—সমাধিতে কি সেবা থাকিতে পারে? সমাধি ভিন্ন কি ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে?

স্বর্ণকলি।—কেন পারিবে না? সমাধির অর্থ জ্ঞানের বিলোপ নয়। তন্ময়ত্বকেই সমাধির অবস্থা বলে। সতী যেরূপ স্বামীর কাছে প্রাণ রাখিয়াও সংসারের কাজ করেন, স্বামী যেমন সতীর প্রেমে সজীব থাকিয়া সংসার সেবা করেন, হরির সহিত মধুর ভাব জন্মিলে, সেইরূপ, তাঁকে প্রাণ দিয়াও মানুষ সংসারের কাজ করিতে পারে। আসল সমাধি, প্রেমেরই পরিণতি, অথবা বিকাশের অবস্থা; সেই অবস্থায় সেবা ভিন্ন আর কিছুতেই মানুষের মন তৃপ্তি পায় না। স্বামী-সেবা, স্ত্রীসেবাতেই এই প্রেমের গভীর অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রামানন্দ স্বামী এতক্ষণ পর একটু পথ পরিষ্কার পাইয়াছেন, বলিলেন,—যাঁহাদেব স্বামী নাই, তাঁহারা কিরূপে এই মধুব রসের আস্বাদন পাইবে?

স্বর্ণকলি।—প্রথমে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রয়োজন, কিন্তু একটু অগ্রসর হইলে আর প্রয়োজন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এই জন্য এই পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের মনে বাল্যকাল হইতে বিশ্বপ্রেমের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা এ পথ না ধরিলেও পারেন, খ্রীষ্টই তাহার দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের উভয়ের জীবনেই মধুর ভাবের সম্যক বিকাশ হইয়াছিল। সকলেই যে বিবাহ করিবে, এখন কোন কথা নাই?

রামানন্দ।—বিশ্বপ্রেম কাহাকে বল, সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ না করিলে কিরূপে বিশ্বপ্রেমের উদয় হইবে?

স্বর্ণকলি।—ঠিক কথা বলিয়াছেন। আমিও বলি—সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ করা চাই। সীমা—সেবাতেই। সেবাকে ধরিলেই প্রেম জন্মে। একটু প্রেমে মজিতে মজিতে শেষে বিশ্বপ্রেমের উদয় হয়।

রামানন্দ।—বিবাহ, সেবারই শাস্ত্র। পরস্পরকে আপনার ভাবিতে অভ্যাস করিতে না শিখিলে, একের জন্য অন্যের জীবন উৎসর্গ করিতে না শিখিলে, প্রেমের পরিণতি হয় না। তুমি কি বল?

স্বর্ণকলি।—তাত বটেই। বিবাহ ত মানুষ করিবেই।

রামানন্দ।—তবে তুমি বিবাহ করিতেছ না কেন?

স্বর্ণকলি ধীর ভাবে বলিলেন, আমি ত বিবাহ করিয়াছি! আপনি তাহা জানেন না?

রামানন্দ স্বামী কথাটার অর্থ বুঝিলেন না, বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, কাহাকে বিবাহ করিয়াছ?

স্বর্ণকলি।—বিবাহের অর্থ আত্মত্যাগ—অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, অন্যের আসক্তিতে মজা, আমি তাহা করিয়াছি; আমার তাহা হইয়াছে।

রামানন্দস্বামী।—কার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ?

স্বর্ণকলি।—রোগী, অনাথ ও দীন দুঃখীর সেবার জন্য।

রামানন্দ স্বামী পুনঃ বলিলেন, আমাকে তুমি যথেষ্ট ভক্তি কর, তা জানি। আমি তোমারই হইব! তোমারই হইতে চাই!

স্বর্ণকলি।—আপনি ত আমারই আছেন! আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আবার যথেষ্ট অনিষ্টের চেষ্টাও করিয়াছেন, কিন্তু আমি একদিনও আপনার অনিষ্ট চিন্তা করি নাই; চিরদিন সমান ভাবে আপনাকে হৃদয়ে পূজা করিয়াছি।

রামানন্দ।—স্বর্ণ, প্রাণের স্বর্ণ, আমি অনেক দূর হইতে তোমারই জন্য সোনাপুরে আসিয়া কুঁড়ে-বাসী হইয়া রহিয়াছি! তোমার জন্য কত রাত্রি জাগিয়াছি,—তোমার জন্য কত দিন আহার করি নাই! তুমি জাননা, এই কুঁড়ে বাসীর যোগ তপস্যা সকলই তুমি।

স্বর্ণকলির চক্ষু আরক্তিম হইল, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, এই জন্য আপনি ধর্ম্মের জটা বাঁধিয়াছেন? এই জন্য আপনি বলিতেছিলেন যে, সংসার-আসক্তিতে মানুষ মজে, ধর্ম্ম হয় না? এই জন্য আপনি আমার উপকার করিয়াছেন? পুরুষ কি স্বার্থহীন হইয়া স্ত্রীলোকের কোন উপকার করিতে পারে না? আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার ধারে বসিয়া কথা বলা আমার আর উচিত নয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি অন্যের, সুতরাং আমার সহিত এরূপ ভাবে কথা বলা আপনার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। আমি আপনার নিকট যে উপকার পাইয়াছি, যদি হরি কৃপা করেন, একদিন তাহা পরিশোধ করিব।

এই কথার পরও রামানন্দ স্বামী নিরস্ত হইলেন না। পাশব বলপ্রয়োগে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। বলপূর্ব্বক স্বর্ণকলির হাত ধরিলেন, এবং বলিলেন, "তোমার পায়ে ধরি, আমাকে চরণে ঠেলিও না,—আমায় রাখ।"

স্বর্ণকলির জীবনে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে, সুতরাং তিনি ভীতা

হইলেন না, রাগও করিলেন না, কেবল একটিবার চীৎকার করিলেন। চীৎকারে অনেক লোক একত্রিত হইল। রামানন্দ স্বামীর লাঞ্ছনার একশেষ হইল। তাঁহাকে দূরে লইয়া গিয়া লোকেরা যতদূর পারিল, অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিল।

অভিমানে এবং লজ্জায় সেই দিনই রামানন্দ স্বামী সোনাপুর পরিত্যাগ করিলেন।

রামানন্দ স্বামীর সোনাপুর পরিত্যাগের পরও স্বর্ণকলি মাতৃশ্মশানে থাকেন। একমাত্র বল ভরসা শ্রীহরির চরণ। রামানন্দের ব্যবহার স্বর্ণকলির হৃদয়কে বড় ব্যথা দিয়াছে। সমস্ত দিন অতিথি সেবা, রোগীর পরিচর্য্যা করেন,—রাত্রে সেই শ্মশানের বৃক্ষমূলে থাকেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই। মাতা, ভ্রাতা, রামানন্দ স্বামী ও সন্ন্যাসীর জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া স্বর্ণকলি যেন কেমন একরূপ হইতেছেন! ইহার উপর আবার অন্যান্য মানুষের দুর্গতি ও পাশব ব্যবহারের কথা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বিশ্বনাথ তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহার একখানি পত্রোত্তরে স্বর্ণকলি এই সময়ে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

পরম পূজনীয়—শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ রায়— মহাশয় সমীপে—

দেব, ভালবাসার বাজারে কেনাবেচা অনেক করিয়াছি, কিন্তু মানুষেরা প্রতারণা করিলেও প্রতারিতা বা ক্ষতিগ্রস্তা হই নাই। আমি অন্যের নিন্দা করিবার জন্য একথা লিখিতেছি না,—নিজের প্রশংসার জন্যও নয়। কেবল মনের আবেগে, যাহা সত্য, তাহাই লিখিতেছি। আপনার আদর্শ ভালবাসা দেখাইয়া আমাকে মাতাইতে আর চেষ্টা করিবেন না। আমি একটি, একটি, একটি করিয়া যত জনকে প্রাণ দিয়াছি, বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট কেবলই ছাই পাইয়াছি—হয় অভিসন্ধি, নয় স্বার্থ, নয় নিন্দা, নয় অপমান। সংসারের এইরূপ বিষাক্ত ব্যবহারে কিন্তু আমার পরম লাভ হইয়াছে,—আমার প্রেম অযাচিত রূপে জগতে ছুটিতেছে,—কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া জগতের জন্য প্রাণ দিতে শিখিতেছি। যাহাকে একবার ভালবেসেছি, তাহা আর ফিরিবার নয়, শত অপমান, নির্যাতন ও আঘাতের পর তবে আমার এ পরম শিক্ষা লাভ হইয়াছে। যদি মানুষের নিকট আমি এত তিক্ত ব্যবহার না পাইতাম, তবে বুঝি বা আমি নিঃস্বার্থ ব্রত পালনে অসমর্থা হইতাম,—

সংসারের পঙ্কিল স্বার্থময় প্রেমের স্রোতে নিমগ্না হইয়া কেবল কল্পনা, কেবল বিলাস, কেবল সুখ-ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিয়া মরিতাম। দেব, আপনি পরম ধার্ম্মিক, আপনি কিনা বুঝিতেছেন। এই জন্যই বলিতে-ছিলাম, আমি অন্যের নিদারুণ ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্তা না হইয়া উপকৃতাই হই-য়াছি। প্রেমের বাজারে যে আমাকে কিছু না দিয়াছে, তার দ্বারাই অধিক উপকৃত হইয়াছি। আমার জীবন-প্রহেলিকার এ এক আশ্চর্য্য ঘটনা যে, কিছু না পাইলেই আমি উপকৃতা হই। মা একদিন আমাকে বলিয়া-ছিলেন—"যে তোমার নিন্দা করে, মনে রাখিবে, সে তোমার পরম বন্ধু; আর যে তোমার প্রশংসা করে, সে তোমার শত্রু!" পরীক্ষায় পড়িয়া মায়ের কথার অমূল্যতত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিতেছি। যে আমার চরিত্রের অন্ধ-কারময় অংশ আবিষ্কৃত করিয়া দেখায়, প্রকৃত পক্ষে সে-ই পরম বন্ধু। কেন না, নিজের দোষ নিজের বুঝা বড়ই কঠিন। প্রশংসায় প্রশংসা, ভাল-বাসায় ভালবাসা, মধুর ব্যবহারে মধুর ব্যবহার—এ সকল প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়—এ সকল ব্যবসার কথা। নিঃস্বার্থ প্রেমব্রত শিক্ষা করিতে হইলে, প্রশংসায় নিন্দা, ভালবাসায় শত্রুতা, মধুর ব্যবহারে তিক্ত ব্যবহার চাই:—নচেৎ জীবনের উন্নতি হয় না। আমি যাহাকে চাই, সে আমাকে চায় না, আমি যার প্রশংসা বা উপকার করি, সে আমার নিন্দা বা অপকার করে, আমি যাহাকে আদর করি, সে আমাকে নির্যাতন করে—এরূপ না হইলে নিঃস্বার্থ ব্রত প্রতিপালিত হয় না। হরির আদেশ এই—আমার বন্ধু আমার প্রকাশ্য শত্রু। আমার উপকারী বন্ধুদিগকে এক দিন না এক দিন শত্রুর বেশ ধারণ করিতে হইবেই হইবে। হরি এইরূপে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। দুঃখের সেবা করিবার জন্যই আমার জন্ম। যার সমুদ্রে শয্যা, শিশির-বিন্দুতে তার ভয় কি? রামানন্দ স্বামী—আমার শত্রু, আপনি বলেন; কিন্তু আমি জানি, তিনি আমার পরম বন্ধু। লোকে ছাই মুষ্টি দিলে আমি সোণামুষ্টি হাতে পাই। হরির এ যে কেমন ইচ্ছা, আমি জানি না। আপনার কোমল প্রাণ আমার জন্য বড়ই ব্যাকুল; কিন্তু স্থির রূপে জানিবেন, লোকের অত্যাচার এই বক্ষে দারুণ আঘাত না করিলে, আমি চরিত্র বা ধর্ম্ম, নিঃস্বার্থ প্রেম বা পুণ্য—ইহার গন্ধও লইতে পারিতাম না। এখনও ধর্ম্ম বা চরিত্র পাই নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্য-পোষাক গৈরিক, ভেক বা নামাবলী

প্রভৃতিও লই নাই। মানুষের আঘাত না পাইলে বিভূতি মাখিয়া আমি পাপের অপরূপ কৃমিকীট রূপে এই পৃথিবীতে পরিশোভিতা হইতাম! আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি, লোকের অত্যাচার ও নিন্দার হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়া আমার অকল্যাণের পথ আবিষ্কার করিতেছেন। মানুষের মতে না মিলিলেই ত নিন্দা করিবে? আপনি কি আমাকে বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া লোকের কলুষিত মতলবের পথ ধরিতে পরামর্শ দেন? লোক সকল আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমাকে দাসী রূপে প্রেমের দ্বারা ক্রয় করিতে চাহে! আমি তাহাতে সম্মতা নাই বলিয়া আমার জীবনে এত অত্যাচার। আপনি কি আমাকে এই কলুষিত পথে যাইতে বলেন? আমার দাদা—চিরকালের জন্য —আমারই জন্য দেশত্যাগী হইয়াছেন, মাতা আমারই জন্য অন্তর্ধান হইয়াছেন! আমি যে সত্যের জন্য একদিন এত কঠোর হইয়াছিলাম, আপনি কি আমাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে বলেন? যার ভাই পথের কাঙ্গাল, সে জীবনে কোন্ সুখের জন্য তৃষিতা হইবে?—সত্যের জন্য যে দিন একমাত্র ভ্রাতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, সত্যের জন্য সেই দিন, দুঃখ, নির্যাতন, অপমানকে অঙ্গের আভরণ করিয়াছি! ভ্রাতৃশূন্যা রহিয়াছি বলিয়াই সোনাপুর এত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ সকলই হরির ইচ্ছা। দেব, আমাকে আবার সংসারের মায়ামোহের দিকে টানিতে চেষ্টা করিবেন না।

আপনার নিকট আমার শেষ অনুরোধ এই, আমার বিবাহের জন্য আপনি লালায়িত হইবেন না। আমাকে যে যা বলে, বলুক। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। আমি হরিকে ধরিতে পারি, কি না পারি, জানি না,—আমি প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝি কি না বুঝি, জানি না; তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পথে কখনও হাঁটিব না;—প্রেমের নামে কখনও রিপু চরিতার্থ করিয়া জীবনকে কলুষিত করিব না। বিবাহও করিব না, এই জন্য। বিবাহ করিয়া মানুষ আরো সঙ্কীর্ণ হয়! বিবাহ করিলে মানুষ আরো স্বার্থেরই পথে, রিপুর পথে প্রবেশ করে! ক্ষমা করুন, আমি ওপথে যাইতে বড়ই ভীতা।

আর যাইবই বা কেন? যার দাদা পথের কাঙ্গাল, তার চক্ষের জল ঘুচিবে না। চির অভাগিনী কন্যার অপরাধ লইবেন না। এই মাতৃশ্মশানই আমার দেব-গৃহ, বৈকুণ্ঠ, সকলই। আপনার স্নেহ-পালিতা—স্বর্ণকলি

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নিদারুণ ঘটনা।

রামানন্দ স্বামীর সোনাপুর পরিত্যাগের পর স্বর্ণকলি একটু শান্তি পাইলেন। কিন্তু সে অল্প কয়েকদিন মাত্র। রামানন্দ স্বামী অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। শ্রীনাথ ও রামানন্দ একদলের লোক,—উভয়ের উদ্দেশ্য স্বর্ণকলিকে হস্তগত করা। উভয়ই এই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বর্ণকলি এবং হরিদাসের উপকার করিয়াছে। এই স্বার্থময় পৃথিবীতে কে স্বার্থ ভুলিয়া পরোপকার করিতে পারে?—করিতে কে বা প্রস্তুত? শ্রীনাথ—স্বর্ণকলিকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন, রামানন্দকে এ জন্য কত পত্র লিখিয়াছেন! শ্রীনাথ কিন্তু জানেন না যে, রামানন্দও স্বর্ণকলির জন্য লালায়িত। রামানন্দ শ্রীনাথের অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন। রামানন্দ যখন দেখিলেন, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার আর সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি শ্রীনাথের জন্যই পথ পরিষ্কার করিলেন। যেরূপে হউক, স্বর্ণকলিকে পাপে ডুবাইতে পারিলেই তাঁহার বাসনা যেন পূর্ণ হয়,—অপমানের প্রতিশোধ তোলা হয়। কি ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণতা!

শ্রীনাথ দীননাথ জ্যোতিষীর নিকট স্বর্ণকলির বিশেষ কিছুই সংবাদ পান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্রুর অর্থ তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন—স্বর্ণকলি দেবী বিশেষ! এই দেবীকে পাইবার জন্য শ্রীনাথের বাসনার আগুন শতগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্য, তোকে শত ধিক; গুণ, তোকেও ধিক! হায়, হায়, স্বর্ণকলি কুৎসিতা বা গুণশূন্যা হইলে, বুঝিবা তাঁর জীবনে এত বিপদ ঘটিত না। মানুষের প্রাণে আর কত সয়?

রামানন্দ বিশেষরূপ অপমানিত হইয়া সোনাপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শ্রীনাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীনাথের অপার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মানুষের ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া অবাক্ হইলেন। শ্রীনাথের নিকট স্বর্ণকলির সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলে স্বর্ণকলিকে অনায়াসে উদ্ধার করা যাইতে পারে, রামানন্দ বলিলেন। শ্রীনাথের অর্থের ভাবনা কি? স্বর্ণকলির জন্য সমস্ত অর্থ তিনি

ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বিষম চক্রান্ত পরিপক্ক হইল। শ্মশান-বাসিনীর চরিত্র-সিংহাসন বুঝিবা এবার বিসর্জ্জিত হয়!

স্বর্ণকলির অতিথি-শালা আবার জাঁকিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিন সেবায় গত হয়, রজনীতে স্বর্ণকলি একাকিনী সেই শ্মশানের বৃক্ষমূলে নির্জন-সাধন বা মাতৃপূজা করেন। সোনাপুরের সকল পাষণ্ড পরাস্ত হইয়াছে। এখন কেহ ভ্রমেও স্বর্ণকলির সাধন ভঙ্গ করিতে এ পথে হাটে না। চরিত্রের বলে স্বর্ণকলি সোনাপুরে আবার জয়-পতাকা উড়াইয়াছেন। চরিত্র-বলের সমতুল্য বল পৃথিবীতে আর কিছুরই নাই, স্বর্ণকলির জীবনের ঘটনাবলী তাহা স্বর্ণাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে দুঃখী দরিদ্রেরা দিবানিশি গাইতেছে—"জয় মা স্বর্ণকলির জয়!"

এইরূপে শান্তিতে কয়েকদিন কাটিল। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, শ্মশানের বৃক্ষমূলে স্বর্ণকলি নাই! এই নিদারুণ ঘটনায় দরিদ্রের ক্রন্দনধ্বনিতে সোনাপুর পরিপূর্ণ হইল! কোন কোন লোক স্বর্ণকলির চরিত্রে একটু দোষারোপ করিল বটে, কিন্তু বিশ্বনাথ রায়, সকলকে ভালরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, রামানন্দ স্বামীর এ এক নূতন চক্রান্ত! বিশ্বনাথরায় স্বর্ণকলির অনুসন্ধানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেন। অতিথি-শালা প্রভৃতি তিনিই চালাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তি বজায় রহিল, কিন্তু কীর্ত্তিদেবী আর সোনাপুরে নাই! সোনাপুর আঁধারে পরিপূর্ণ হইল। লোক সমাগম ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মানুষের পাশব ব্যবহার!

কলিকাতার পথ,—আলাইপুর বন্দরের নিকট অনেক নৌকার বহর লাগিয়াছে! কলিকাতার নৌকা সকল ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শত শত নৌকার বহর বাঁধা রহিয়াছে। বোঝাই নৌকা, পান্সী, সিপ্, ডিঙ্গি—কত দেশের কত রকম রকম নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। পূর্ব্ব-দিক হইতে সমস্ত রাত্রি পালভরে একখানি নৌকা চলিয়া আসিয়াছে; আলাইপুরের বন্দরের ঘাটে সেখানিও এইমাত্র লাগিয়াছে। রাত্রি প্রভাত

হইয়াছে। অসংখ্য নৌকার ছইয়ে ছইয়ে ঠেসাঠেসি হইয়া রহিয়াছে। ভাটার আর অধিক বাকী নাই। মাঝীরা সকলে প্রস্তুত হইতেছে। যে নৌকা খানি এই মাত্র আসিয়া লাগিল, সে নৌকা খানির মধ্যে তুমুল ঝগড়া উপস্থিত হইতেছে। ঘটনা কি, জানিবার জন্য বহু লোক একত্রিত হইয়াছে। বিষম গোলযোগ উপস্থিত।

নৌকায় ছদ্মবেশী রামানন্দ স্বামী ও দীননাথ জ্যোতিষী এবং অপহৃতা স্বর্ণকলি। গভীর রাত্রে স্বর্ণকলি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলেন, সেই সময়ে সতর্কভাবে দীননাথ ও রামানন্দ—স্বর্ণকলিকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া আসিয়াছেন। স্বর্ণকলির অবসন্ন মস্তিস্কে সেদিন দারুণ নিদ্রা উপস্থিত হইয়াছিল। রামানন্দ ও দীননাথ তিন দিন সুযোগ পান নাই, চতুর্থ দিনে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন! চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—জনপ্রাণী রহিত শ্মশানক্ষেত্র;—এইরূপ ঘটনা ঘটিবে, কে জানে? আকাশে চাঁদ অস্তমিত—এমন সময়ে সোনাপুরের জ্যোতি অপহৃত! রামানন্দ ও দীননাথের মনে এতও ছিল!!

আলাইপুরের ঘাট লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণ দিকের খালের মধ্যে নৌকা রহিয়াছে! এইরূপ কোলাহল ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে।

স্বর্ণকলি।—আত্মহত্যা করা বড় পাপ, কিন্তু তাতেও কুণ্ঠিতা হইব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন্, নচেৎ জলে ঝাঁপ দিব।

রামানন্দ।—তাহা অসাধ্য। এখন তুমি অসহায়া, আমাদের হাতে পড়িয়াছ, কিছুতেই জলে ঝাঁপ দিতে পারিবে না! সঙ্গে কত লোক, দেখিতেছ না!

স্বর্ণকলি একথার উত্তরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—চতুর্দ্দিকে এত লোক দেখিতেছি, কেহ কি অসহায়াকে রক্ষা করিবে না? ইহারা আমাকে সোনাপুর হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, কে আছ, রক্ষা কর। আমার সতীত্ব যাক্—জীবন যায়, কে আছ, সহায় হও!

অবলার করুণ স্বরে চতুর্দ্দিকের লোক সকল মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। লোক সকল ধর ধর বলিয়া নৌকার উপর পড়িতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নৌকায় ১০।১২ জন প্রহরী ঢাল ও নিষ্কাশিত অসি হস্তে লইয়া পাহারা দিতেছে—লোক ঝুকিতেছে, কিন্তু সাহস করিয়া নৌকায় উঠিতে পারিতেছে

না! প্রহরীরা ভীমস্বরে বলিতেছে—"যে নৌকায় উঠিবে, তার শির লইব।" লোকেরা কিছু করিতে না পারিয়া কনষ্টেবল ডাকিতে চলিল, কেহ কেহ পুলিসে সংবাদ দিতে গেল! তাহারা সরল-প্রাণ, জানে না যে, পুলিস ধনীর গোলাম!

স্বর্ণকলিকে কেহই উদ্ধার করিতেছে না দেখিয়া তিনি পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। জলে ঝাঁপ দিতে চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু দুই হাত দুই পাষণ্ড ধরিয়া রহিয়াছে! জন্মদুঃখিনী স্বর্ণকলিকে আজ কে রক্ষা করিবে? যম-কিঙ্করদের হাতে আজ স্বর্ণের প্রাণ যায়! "পৃথিবি, বৃক্ষ, নদি, তোমরা সকলে সাক্ষী;—অবলার সতীত্বের নিকট প্রাণ তুচ্ছ—আজ অবলার অপরাধ কেহ ধরিও না।" স্বর্ণকলি এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছেন এবং নৌকার কাঠে মস্তক আঘাত করিতেছেন! কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, বস্ত্রাদি রক্তময় হইয়া গিয়াছে। টানাটানিতে হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। চক্ষু হইতে রক্ত-মিশ্রিত জল পড়িতেছে—স্বর্ণকলির সে দৃশ্য অতি ভয়ানক।

রামানন্দ মাঝীদিগকে তিরস্কার সহকারে হুকুম করিলেন, "নৌকা খোল্, উজান ঠেলিয়া চল্।"

স্বর্ণকলি উভয়ের পা ধরিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, বস্ত্রাদি ঠিক করিবার জন্য একবার হাত ছাড়িয়া দিতে বলিলেন! কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের দয়া হইল না। অবশেষে সমস্ত শরীরের শক্তি একত্রিত করিয়া উভয়ের হাত ছাড়াইলেন এবং দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অনেক লোক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ছোট নদী, কিন্তু স্রোত খরতর। নৌকার মাঝীরাও অনেকে পড়িল। ১০।১২ মিনিটের মধ্যে স্বর্ণকলিকে পাওয়া গেল না। রামানন্দ ও দীননাথের মুখ মলিন হইয়া উঠিল! বড় সাধের আশায় ছাই পড়িবে কি?

ইত্যবসরে পুলিশের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীবরদিগকে জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করা হইল। আরো ৫ মিনিট সময় গেল। তারপর হঠাৎ একজন লোক অচেতন অবস্থায় স্বর্ণকলিকে তুলিল! চতুর্দ্দিকে মহা আনন্দের রোল উঠিল।

স্বর্ণকলি এখন অচেতন, কে তাঁহার হইয়া এখন চেষ্টা করিবে? রামানন্দ

পুলিসের লোককে ২০৲ টাকা,সমবেত লোকদিগকে সন্দেস খাইতে ১০৲ টাকা, এবং ধীবরদিগকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিয়া নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন, সকলকে বলিলেন "মেয়েটী স্বামীর বাড়ী যাইতে রাজি নয় বলিয়া এইরূপ করে, ইহার স্বামী কলিকাতায় আছেন।" এই কথার পর আর কেহ কিছু গোল করিল না। সেই অচেতন অবস্থায় স্বর্ণকলিকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া হইল। মাঝীরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন ভাটার খুব টান পড়িয়াছে— নৌকা তীরবেগে খুলনা অভিমুখে চলিল। খুলনায় তখনও রেল হয় নাই। খুলনা হইতে কিছু ঔষধ লইয়া রামানন্দ কলিকাতার দিকে নৌকা চালাইতে বলিলেন। স্বর্ণকলি দুই দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-শূন্যা ছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীনাথ ও স্বর্ণকলি।

অজ্ঞাত বাসের সময় অতীত হইয়াছে। শ্রীনাথ, হরিদাস ও বলরাম সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন,—ব্যস্ত হইয়াছেন। তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাঁহারা বিভিন্ন পথ ধরিয়াছেন, এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনের জীবনের উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তন-স্রোত বহিয়া গিয়াছে! পুলিসের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া কত সহজ, তিন জনই উপযুক্ত রূপ বুঝিয়াছেন। শ্রীনাথ এখন কলিকাতার একজন বড়লোক,—পুলিসের বাবারও সাধ্য নাই তাঁহার ধারে যায়। বলরাম সাঁওতাল ও কোলদিগের মা বাপ, দরিদ্র হইয়াও রাজা বিশেষ,—পুলিস তাঁর ভয়ে জড়সড়। আর হরিদাস—সামান্য বৈরাগীর ন্যায় পথের ভিক্ষুক, প্রেমের গুণে সকলকেই বশ করিয়াছেন ;—পুলিসও তাঁহাকে সন্দেহ করে নাই। হরিদাস এই ৩ বৎসরে গয়া কাশী বৃন্দাবন সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। সঙ্গে—সেই অনাথা বাল-বিধবা লীলা। বলরাম মধুবনের নিকটস্থ দান্তাবনের রাজা,—সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর অপহৃতা বলরামপুরের তারিণী চক্রবর্ত্তীর বিধবা মেয়ে সেবা। বুদ্ধিতে কত অসাধ্য সাধন করা যায়, শ্রীনাথ তাহা জগৎকে দেখাইয়াছেন। শরীরের বলে কত অসাধ্য সাধিত হয়, বলরাম তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। প্রেমের শক্তিতে কি করা যায়, হরিদাস দারিদ্র্যের ভিতর থাকিয়াও তাঁহা দেখাইয়াছেন।

আর এই তিনের উপরে চরিত্রের পরাক্রম কতদুর, স্বর্ণকলি তাহার দৃষ্টান্ত! গ্রন্থকার বলেন, জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি সেবা, প্রেম কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও চরিত্র বিহনে সব অসার,—সকলেরই পরিণাম নরক! ধর্ম্মই একমাত্র শক্তি, চরিত্রই এক মাত্র মহাবল।

যা'ক। ৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরিদাস দুঃখ কষ্টের কষাঘাত সহ্য করিয়া এখন জীর্ণ শীর্ণ। কিন্তু ভাবে গদ্গদ-চিত্ত। বলরাম আরও তেজিয়ান, শ্রীনাথ আরো বুদ্ধিমান হইয়াছেন। প্রেম—আত্মবিস্মৃতিতে, হরিদাস তাহার দৃষ্টান্ত। শারীরিক শক্তি বিকাশ পায় বীরত্বে, বলরাম তার দৃষ্টান্ত। লোকেরা বলে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়—আত্মাভিমানে; শ্রীনাথ তাহার নিদর্শন। বিভিন্ন পথগামী এই তিনের মিলনের দিন কি অপরূপ মিলনই হইবে!

তিনের ব্রত কতদূর প্রতিপালিত হইয়াছে, দেখাইয়াছি। বলরাম ব্রতের কিছু কিছু পালন করিয়াছেন। হরিদাস আরো কিছু। আর শ্রীনাথ? বুদ্ধিমানের নিকট পৃথিবীর কোন্ কার্য্য উপহাসের নয়? বাল্যক্রীড়া, ভারত-স্বাধীনতার কথা চপলের খেলা, সে সকল এখন ভস্মে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কথার চটাপট—"মুখেন মারিতং জগৎ" "বলং বলং বাক্যবলং"— শ্রীনাথ ইহারই জোরে সমাজে পদস্থ ব্যক্তি। যাহার মান সম্ভ্রম আছে, পদমর্য্যাদা আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, সে তোমার ভারতের দুঃখের চিত্র লইয়া গরীবের গলা ধরিয়া কাঁদিতে বসিবে? এমন হিতৈষণা কীর্ত্তিনাশার জলে ফেলিয়া দেও। শ্রীনাথ এখন বাবু—বক্তা, নেতা, দেশ-সংস্কারক—সকলই। কিন্তু তিনি দরিদ্রের বন্ধু নন্, ভারতের মঙ্গলের কেহ নন্। তিনি কেবল তাঁহার যশ মান উপার্জ্জন হয় যাহাতে, তাহারই! গুপ্ত চরিত্রের বিচার কে করে? তিনি এখন বড় লোক;—সোণার ভারতের একজন,—এক বড় জন!

স্বর্ণকলি শ্রীনাথের বাড়ীতে আনীতা হইয়াছেন। শ্রীনাথ স্বর্ণকলির উপকারী বন্ধু—এজন্য শ্রীনাথকে স্বর্ণকলি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। রামানন্দস্বামী ও দীননাথ উভয়ই স্বর্ণকলির নিকট উপেক্ষার জিনিস হইয়াছেন—উভয়ই স্বর্ণকলির নিকট ধরা পড়িয়াছেন; কিন্তু শ্রীনাথ এখনও ধরা পড়েন নাই। স্বর্ণকলি শ্রীনাথের বাড়ীতে আসিয়া উপকারী শ্রীনাথকে দেখিয়া একটু সুস্থির হইয়াছেন, কিন্তু সোনাপুরের অতিথিশালার কথা ভাবিতে ভাবিতে জীর্ণা শীর্ণা হইতেছেন। পিতা মাতার কীর্ত্তি লোপ পাইল, এ দুঃখ

স্বর্ণকলির রাখিবার ঠাঁই নাই। শ্রীনাথের পা ধরিয়া কাতরস্বরে কতবার মিনতি করিয়া বলিয়াছেন—"শ্রীনাথ বাবু, আমাকে সোনাপুরে পাঠাইয়া দিন, সেখানে আমি বেশ ছিলাম, সেখানে আমি বেশ থাকিব।"

শ্রীনাথ প্রতিবারে এ কথার উত্তরে বলিয়াছেন—"তোমারই জন্য এই অপার ঐশ্বর্য্য। তুমি না থাকিলে এ সকল কে ভোগ করিবে?"

উপকারী বন্ধুর কথাকে তুচ্ছ করিতে এবং শ্রীনাথের মনে বেদনা দিতে স্বর্ণকলি অনিচ্ছুক। স্বর্ণকলি বড় বিভ্রাটে পড়িয়াছেন।

একদিন স্বর্ণকলি একটু পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন—"আমি অনেক দিন আসিয়াছি, আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না, আমাকে পাঠাইয়া দিন।"

শ্রীনাথ।—তোমার জন্যই এ সকল। অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সকল সংগ্রহ করিয়াছি—কেবল তোমার জন্য। তুমি থাকিবে না, আশ্চর্য্য কথা? তোমার দুঃখ কষ্ট আমার অসহ্য, তা কি জান না?

স্বর্ণকলি।—জানি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। কিন্তু হরির কৃপায় এখন আর আমার কষ্ট নাই। আমি সোনাপুরে বেশ সুখে ছিলাম। এখানেই বরং আমার কষ্ট।

শ্রীনাথ।—কি কষ্ট?

স্বর্ণকলি।—কষ্ট এই—আপনার অপার ঐশ্বর্য্য, কিন্তু এক দিনও একটি কাঙ্গাল দরিদ্র একমুষ্টি অন্ন পায় না, একটি অন্ধ বা খঞ্জ একটি পয়সা পায় না। সোনাপুরের অতিথিশালার এক পয়সা আয় নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সেখানেও প্রত্যহ শত শত লোক অন্ন পায়! আমি আপনার ঐশ্বর্য্যের এ দৃশ্য দেখিতে চাই না। আমি এখানে আসিয়া অবধি দরিদ্রের সেবা ভুলিয়া গিয়াছি!

এই কথা বলিতে বলিতে স্বর্ণকলির চক্ষের জল পড়িল।

শ্রীনাথ বলিলেন, এতদিন দরিদ্রের সেবা করিয়াছ, কয়েকদিন নয় আমার সেবা কর।

স্বর্ণকলি।—আপনার ত আর চাকর চাকরাণীর অভাব নাই! গরীবদের যে আর কেহ নাই!

শ্রীনাথ।—চাকর চাকরাণী আছে সত্য, কিন্তু তাহারা অর্থের গোলাম বইত নয়? এই পুরীতে আমার আপনার জন কেহই নাই। তুমি আমার আপনার জন, তাই তোমাকে রাখিতে চাই।

স্বর্ণকলি।—আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনার নই ?

শ্রীনাথ।—তুমি কাহার ?

স্বর্ণকলি।—আমি দরিদ্র কাঙ্গালের।

শ্রীনাথ।—কত দিন ?

স্বর্ণকলি।—আপনারা আসিয়াছেন পর হইতে এ জীবন তাহাদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি।

শ্রীনাথ।—প্রতিজ্ঞা করিযাছ ?

স্বর্ণকলি।—প্রতিজ্ঞা করি নাই, কিন্তু সঙ্কল্প এই। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন কি, কাজটা ত মন্দ নয় !

শ্রীনাথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও তাহা পালন করেন নাই, স্বর্ণকলি প্রতিজ্ঞা না করিয়াও কত দৃঢ়া; সুতরাং লজ্জায় তাঁহার মুখ একটু নত হইল। বলিলেন,—কাজটা ভাল, কিন্তু চিরকাল এ কঠিন সঙ্কল্প পালন করা কঠিন। ইহার পদে পদে বিঘ্ন।

স্বর্ণকলি।—বিঘ্ন আছে, বিঘ্ন-বিনাশন হরিও আছেন। দীনার উপায় তিনিই;—ভয় করি না।

শ্রীনাথ।—এ সঙ্কল্প কি কখনও পরিত্যাগ করিবে না ?

স্বর্ণকলি।—ইচ্ছা, কখনও না করি ; কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে ?

শ্রীনাথ।—ভবিষ্যত আমি জানি। ভবিষ্যতে তুমি এই ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী।

স্বর্ণকলি।—মিথ্যা কথা। যে ঐশ্বর্য্য দুঃখী দরিদ্রের নয়, তাহা আমি স্পর্শ করাকেও পাপ মনে করি।

শ্রীনাথ।—আর এ ঐশ্বর্য্য যদি দরিদ্রের নামে লিখিয়া দি, তবে তুমি স্পর্শ করিবে ত ? তবে তুমি এখানে থাকিবে ত ?

স্বর্ণকলি।—দরিদ্রের নামে লিখিয়া দিলে দরিদ্র ব্যক্তিরাই তাহা স্পর্শ করিবে, আমি স্পর্শ করিব কেন ?

শ্রীনাথ।—তোমাকে যদি দরিদ্রের মা করিয়া দি।

স্বর্ণকলি।—তবুও আমি থাকিব না। অরণ্যে অরণ্যে আমার এই শরীর পাত করিব, ইহাই আমার দ্বিতীয় সঙ্কল্প।

শ্রীনাথ কোনরূপেই স্বর্ণকলির মন পাইতেছেন না, তজ্জন্য মনটা বড়ই উচাটন হইয়াছে, বলিলেন, তুমি কখনও বিবাহ করিবে না ?

স্বর্ণকলি।—না—কখনই না।

শ্রীনাথ।—কেন?

স্বর্ণকলি।—বিবাহ করিলে লোক স্বার্থপর হয়, সঙ্কীর্ণ হয়। আপন পুত্র কন্যা ভিন্ন অন্যের মুখের দিকে চায় না। এইজন্যই বিবাহ করিব না।

শ্রীনাথ।—তোমার ন্যায় যাহাদের এরূপ শুভ সঙ্কল্প, তাহাদের পক্ষে একথা খাটে না।

স্বর্ণকলি।—পৃথিবীতে কত লোকের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল; দেখিয়াছি, বিবাহের পর তাহারা যেন অন্য জগতের জীব হইয়া গিয়াছে!

শ্রীনাথ।—বিবাহ করাকে তবে তুমি পাপ মনে কর?

স্বর্ণকলি।—সকলের পক্ষে নয়, আমার পক্ষে।

শ্রীনাথ।—তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র বিধান কেন?

স্বর্ণকলি।—কেন না, আমি যে দরিদ্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

শ্রীনাথ।—দশজনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছ, সেই সঙ্গে আর একজন যোগ করিতে পার না?

স্বর্ণকলি।—একজন কেন, শত জন পারি; কিন্তু আপনার ন্যায় একজন ধনবানকে সেই সঙ্গে যোগ করিতে পারি না! না—আমি কখনও বিবাহ করিব না।

শ্রীনাথ।—তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ?

স্বর্ণকলি সচকিতা হইয়া বলিলেন, "ঘৃণা করিব কেন? কাহাকেও ঘৃণা করিতে মানুষের অধিকার নাই!

শ্রীনাথ।—আমি যে অপরাধী!

স্বর্ণকলি।—আমিও ত অপরাধিনী! পাপী অন্য পাপীকে ঘৃণা করিবে?

শ্রীনাথ।—রামানন্দ ও দীননাথকেও ঘৃণা কর না?

স্বর্ণকলি।—এক দিনও না। তাঁহাদের ব্যবহারে সময়ে সময়ে কষ্ট পাইয়াছি সত্য, কিন্তু এক দিনও তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি নাই!

শ্রীনাথ।—তাহারা তোমার উপকারের ছলনায় তোমার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল না?

স্বর্ণকলি মুখ অবনত করিলেন, বলিলেন, তা বিধাতা জানেন! তাঁহাদের দ্বারা এ পর্য্যন্ত আমার কোন অনিষ্ট হয় নাই। সতীত্ব অপহরণ ত দূরের কথা! তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মোটের উপর আমার মঙ্গলই হইয়াছে!

শ্রীনাথ।—তাহারাই ত তোমাকে এখানে আনিয়া কষ্টে ফেলিয়াছে!

স্বর্ণকলি।—তাঁহারা এখানে আনিয়াছেন বলিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে! তাঁহারা ত আমার মঙ্গলই করিয়াছেন!

শ্রীনাথ।—তোমাকে এজন্য কষ্ট পাইতে হইতেছে না?

স্বর্ণকলি।—কষ্ট ত আমার জীবনেব সুখ! যাঁর দ্বারা যত কষ্ট পাইয়াছি, তিনিই ধর্ম্মপথে আমাকে তত তুলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনাথ।—যদি তোমাকে আরো কষ্টে ফেলা হয়।

স্বর্ণকলি।—আপনাদের ইচ্ছা হইলে, তাহাই আমার আশীর্ব্বাদ! আমি তাতে ভীতা নই?

শ্রীনাথ।—তুমি এখন কাহাদের হাতে, তা জান?

স্বর্ণকলি।—আমি উপকারী বন্ধুর হাতে পাড়য়াছি, তা জানি। দাদা আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিতেন, তাও জানি!

শ্রীনাথ একটু লজ্জিত হইলেন, এদিকে সুবিধা না পাইয়া বলিলেন, তুমি বিবাহ কর, তোমার দাদার ইচ্ছা।

স্বর্ণকলি।—দাদার ইচ্ছা শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু দাদা এখন নিরুদ্দেশ। দাদার ইচ্ছা কিনা, কেমনে জানিব?

শ্রীনাথ।—তিনি আমার নিকট তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

স্বর্ণকলি।—তিনি কোথায়?

শ্রীনাথ।—যদি প্রস্তাবে সম্মত হও, সাক্ষাৎ করাইব।

স্বর্ণকলি।—আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, দাদার সেরূপ ইচ্ছা কখনও হইতে পারে না।

শ্রীনাথ।—তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছ?

স্বর্ণকলি।—দাদাকে আমি যেরূপ জানি, তিনি কখনও বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই, মনে হয়। যাহা হউক, দাদার সহিত সাক্ষাৎ হউক, সব ঠিক হইবে।

শ্রীনাথ আর উপায় না দেখিয়া দাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। মিলনের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,—মিলনের দেশে যাইবার জন্য শ্রীনাথ আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণকলি দাদাকে পাইবেন ভাবিয়া একটু ইষ্টচিন্তা হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাগরতীরে।

ফাল্গুন-মাস, দোল-পূর্ণিমা, পুরীতে আর লোক ধরে না। পুরীর পঞ্চ-তীর্থের যেখানে যাও, কেবল লোক। স্ত্রীপুরুষ, জ্ঞানী মূর্খ, ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের লোক-সমাগমে পুরী আজ পরিপূর্ণ! এমন তীর্থও আর নাই, এমন লোক-সমাগমও আর কোথাও হয় না। ধর্ম্মের এরূপ উদার সার্ব্ব-ভৌমিকতাও আর কোথাও নাই, এমন লোকের ভিড়ও আর কোথাও হয় না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, বৌদ্ধ, জৈন, সকল সম্প্রদায়ের দেবতা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং সকল শ্রেণীর লোক জাতি নির্ব্বিশেষে এখানে আগমন করিয়া থাকে। বিশ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হউক কিম্বা লক্ষ লোক উপস্থিত হউক, পুরীর ভোগ-মন্দির অন্ন ব্যঞ্জন যোগাইতে কখনও বিমুখ হয় না। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না। যত লোক পুরীতে আগমন করুক, সকলেরই আহারের দ্রব্যাদি পুরীর ভোগমন্দিরে মিলিবে। এ যেন অন্নপূর্ণার অনন্ত ভাণ্ডার। পুরীর অসংখ্য যাত্রীনিবাসেও আর লোক ধরে না—সুতরাং রাস্তায় রাস্তায়, বৃক্ষের তলায় তলায়, সমুদ্রের উপকূলের সৈকত-ময় স্থান সমূহে পর্য্যন্ত—অগণ্য লোক আশ্রয় লইয়াছে। আহারের ভাবনা নাই, যত প্রয়োজন পয়সা দিলেই তত প্রসাদ মিলিবে, বিশ্রামের জন্য খোলা সমুদ্রের বিস্তৃত তট পড়িয়া রহিয়াছে। সহস্র সহস্র মাইল দূর হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী পদব্রজে আসিয়াছে, কাহার পা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, কাহার জ্বর হইয়াছে, কেহ ওলাউঠার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে—তার উপর উত্তপ্ত বালু রাশির উপর শয়ন, প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ, কিন্তু তবুও কাহারও মুখে নিরানন্দের চিহ্ন মাত্র নাই। দেব-দর্শন হইয়াছে, সকলের প্রাণ সুস্থ হইয়াছে। কষ্ট আর কষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রফুল্ল মুখে যাত্রীগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এমন মহাতীর্থ আর কোথাও নাই।

আজ পূর্ণিমানিশি, জগন্নাথ সাগরতীরে আজ জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন। নিষ্কলঙ্ক চাঁদের সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গনে সাগর আজ উছলিয়া উঠিতেছে। বালির উপর বালি, তার উপর বালি,-উপকূলময় বালি রাশীকৃত, স্তূপীকৃত। বায়ু অনন্ত মুক্ত স্থান পাইয়া আপন তেজে সোঁ সোঁ করিয়া বহিতেছে, আর বঙ্গোপসাগরের উত্তর-বাহিনী তরঙ্গ সমূহ ভীম গর্জ্জনে এই সৈকতময় প্রাচীরে প্রহত হইতেছে। নীল জলরাশিতে চাঁদের হাসি মিশিয়া গিয়াছে—বায়ুর হিল্লোলে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস বাড়িতেছে, তরঙ্গের কোলাকুলিতে, ঘাত প্রতিঘাতে রাশি রাশি ফেণা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে ঐ চাঁদের জ্যোতি ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। তরঙ্গের পিছে তরঙ্গ, ৩০ হাত ৪০ হাত উচ্চ তরঙ্গ গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া হুঙ্কারে ছুটিতেছে! সে দৃশ্য অতি ভয়ানক। সে দৃশ্য অতি মধুর! সে দৃশ্য অতি পবিত্র। জগন্নাথ যেন পুরীর সাগর-তীরে আজ জীবন্ত ভাবে অবতীর্ণ! দুঃখের বিষয়, পুরীর যাত্রীগণ এই জীবন্ত দেবলীলা দেখিতে তত উল্লসিত নয়!

যাত্রীরা তবে কিসের জন্য লালায়িত? পুরীর মন্দির-সমষ্টির অসংখ্য অশ্লীল কদর্য্য ছবি দেখিতে তাঁহারা বড়ই পুলকিত! দলে দলে লোক, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল কদর্য্য ছবি দেখিতেছে, এবং পাণ্ডাদের মুখে উহাদের ঘৃণিত উপাখ্যান শুনিতেছে। সে সকল কদর্য্য চিত্র এত কদর্য্য যে, মানুষের চিন্তায়ও তাহা পৌঁছে না! এই সকল ছবি প্রকৃত নরকের চিত্র। এই সকল ছবি দেখিয়া যে কত পবিত্র চরিত্র কলুষিত হইতেছে, কে জানে? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাপ ক্রয় করিয়া ফিরিতেছে, কে জানে? মানুষকে পাপে ফেলিবার এমন আশ্চর্য্য ফাঁদ আর কোথাও নাই!

সত্যই তাই। শ্রীনাথ স্বর্ণকলিকে লইয়া পুরীতে পৌঁছিয়াছেন। বাসনা এই, কোন রূপে ইঁহাকে পাপে ডুবাইবেন! পুরীর পথে কতরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তার শেষ নাই। পাণ্ডাদের অশ্লীল গান শুনাইয়া, পাণ্ডাদের নির্লজ্জ ব্যবহারে মজাইয়া স্বর্ণকলিকে ডুবাইবার জন্য শ্রীনাথ কত কি করিয়াছেন,, লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে! পুরীর পথের চটীতে স্বর্ণকলির প্রতি নির্লজ্জ ব্যবহারের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে! সে সকলের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মানবচরিত্রের প্রতি আর ঘৃণা জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। যে স্বর্ণকলি পূর্ব্বে পুরুষের দশ হাত দূরে ভিন্ন উপবেশন করিতেন না,

চটীতে সেই স্বর্ণকলিকে এক বিছানায় পর্য্যন্ত শয়ন করান হইয়াছে! আপত্তি করিলে পাণ্ডারা বলিয়াছে,—ইহাতে কোনই দোষ নাই, জগন্নাথ দর্শনে যাইবার সময় লজ্জা শরম বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হয়! স্ত্রীজাতির প্রতি পাণ্ডাদের নানা রূপ ঘৃণিত ব্যবহার ভাষায় ব্যক্ত হয় না। রামানন্দ ও দীননাথ হার মানিয়াছে। স্বর্ণকলি ভাবিতেছেন, তাঁহারা এই চরিত্র-ধ্বজী পাণ্ডাদের তুলনায় দেবতা। পুরীর চটী-সমূহ ভয়ানক বিঘ্ন-সঙ্কুল। বহু লোকের চরিত্র যায়, পুরীর পথে। আর অনেকের চরিত্র—পুরীর অশ্লীল ছবির দৃষ্টান্তে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়। স্বর্ণকলি পাণ্ডাদের পুরীর পথের অত্যাচারের হাত হইতেও অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন। এজন্য শ্রীনাথ বুঝিয়াছেন্—স্বর্ণকলিকে নিমগ্ন করা বড়ই কঠিন! স্বর্ণকলি বুঝিতেছেন—এই জীবন্ত পাপ-সংগ্রামে জয়লাভ করা অসম্ভব। হা বিধাত, তবে রক্ষার উপায় কোথায়? শ্রীনাথের চেষ্টার এখনও বিরাম হয় নাই। পুরীর সকল মন্দির দেখান হইয়াছে—তাহাতেও স্বর্ণকলির মন বিচলিত হয় নাই। স্বর্ণকলি জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া মোহিতা হইয়াছেন। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনে জগন্নাথের চিন্তা, জগন্নাথের রূপ জাগিতেছে। স্বর্ণকলি—প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন।

স্বর্ণকলি প্রেমে উন্মত্ত; শ্রীনাথ রিপুর জ্বালায় উন্মত্ত। তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। জগন্নাথ দেবকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় দ্বিহস্ত পরিমিত, দারুণ অন্ধকারময়, প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান দিয়া যাইতে হয়! সে অতি ভয়ানক স্থান। অমাবস্যার অন্ধকার সেখানে পরাস্ত! এই সর্ব্বনেশে স্থানে কত সতীর সতীত্ব যে নষ্ট হইয়াছে, সংখ্যা নাই! উন্মত্ত শ্রীনাথ হরিদাসের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না, আর কোথাও কোন রূপ কৃতকার্য্য না হইয়া পশু সম পাণ্ডাদের উপদেশে এই স্থানে স্বর্ণকলিকে আক্রমণ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন! কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা!!

আজ বন্ধুদের মিলনের দিন,—আজই উৎসবের শেষ দিন। আজ পূর্ণিমা তিথি, আনন্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ। মন্দিরে আর লোক ধরে না। কত লোক পায়ের নীচে পেষিত হইয়া যাইতেছে! একে এই ভিড়, তাহাতে শ্রীমন্দিরের বেদীর পশ্চাতদিকে দারুণ অন্ধকার! শ্রীনাথ বড় সুসময় পাইয়াছেন। সেই ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে সত্যই শ্রীনাথ যখন স্বর্ণকলিকে আক্রমণ করিলেন, তখন স্বর্ণকলি আপনার তেজে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া, বায়ু কম্পিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সে করুণ চীৎকারে জগন্নাথদেব

পর্য্যন্ত যেন বিচলিত হইলেন। চতুর্দ্দিকের নরনারী স্বর্ণকলির চীৎকারে অধীর হইয়া উঠিল, এবং আত্মহারা হইয়া নিমেষের মধ্যে শ্রীনাথকে পদতলে ফেলিয়া পেষিত করিল। সে দৃশ্য ভীষণ দৃশ্য! নরনারী অভিসম্পাত করিয়া শ্রীনাথের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল;—কেহ কেহ বলিল—"পামর, তোকে যেন আজ আর এ পবিত্র মন্দির হইতে ফিরিয়া যাইতে না হয়!" বাস্তবিকও শ্রীনাথের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইল। সঙ্গের লোকেরা এমন সময়ে শ্রীনাথকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল। তখন একটু একটু শ্বাস বহিতেছিল! স্বর্ণকলি শ্রীনাথের এই অবস্থা দেখিয়া, প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন,সকল অপরাধ ভুলিয়া আবার যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মস্তিষ্কে জলসিঞ্চন করাতে ও শরীরে বাতাস দিতে দিতে শ্রীনাথ অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ হইলে, পাল্কীতে করিয়া সাগরতীরে কালেক্টরি কাছারীর সম্মুখে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল। সাগরের মুক্ত বায়ু লাগিয়া শ্রীনাথ আর একটু সবল হইলেন! স্বর্ণকলি—সাধ্যানুসারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী গাঢ়তর হইয়া আসিল। বায়ু সোঁ সোঁ রবে বহিতেছে;—আর সাগর-তরঙ্গ গভীর নাদে নাচিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে! লোক-সাগর এখন নিস্তব্ধ। শ্রীনাথ শর্য্যায় শয়ান—স্বর্ণকলি একাকিনী আশ্চর্য্য স্নেহ-বিগলিত চিত্তে শুশ্রূষা করিতেছেন! নিশীথ সময়ে বলরাম ও হরিদাস পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিয়ম একটুও ভঙ্গ হয় নাই। তিন বৎসর পর—তিনের মিলন হইল। তিনই বা কেন বলি—ছয় জনের মিলন হইল। হরিদাসের সঙ্গে সেই কঙ্কালাবশিষ্টা লীলা, বলরামের সঙ্গে চিরকলঙ্কিনী সেবা, শ্রীনাথের সঙ্গে দেবী স্বর্ণকলি! মিলনে যে কিরূপে আনন্দ প্রবাহ ছুটিল, বর্ণনা করা অসাধ্য। এই মাত্র বলি—সকলের মনেই আনন্দ, স্বর্ণকলি কেবল বিষাদে অবনতা। কেন, কে জানে?
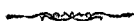
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীনাথের সঙ্কল্প।

মিলনানন্দের উচ্ছ্বাসান্তে সকলে সকলের কথা শুনিলেন। প্রতি জনের তিন বৎসরের ইতিহাস এত আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ যে, পরস্পরের কথা শুনিয়া তিন জনই মোহিত হইলেন। শ্রীনাথের শরীরের উপর দিয়া সম্প্রতি যে বিভ্রাট গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীনাথ লজ্জায় অবনত; কিন্তু ভিতরের কথা হরিদাস বা বলরাম কেহই জানিতে পারেন নাই। বিষাদে স্বর্ণকলি মলিনা, কিন্তু উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে কথা বলিতে সঙ্কুচিতা। শ্রীনাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই পৃথিবীতে হইবে কি না, কে জানে?

স্বর্ণকলি এতদিন পর দাদাকে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ শীতল হইল। *দাদার জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল*, মনে করিলেন, এই কঠোর পরীক্ষায় দাদার কলঙ্করাশি বিধৌত হইয়াছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও হাসিমুখে দাদার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না; মনের মধ্যে সর্ব্বদাই মানুষের পশু ব্যবহার জাগিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে, বিষপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করেন। জীবনের পূর্ব্ব সঙ্কল্প সব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু তাতে যেন হৃদয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে তার মুখে ঘোরতর বিষাদের ছায়া। এমন বিষাদের ছায়া তাঁর সদা প্রসন্ন মুখে আর কখনও শোভা পায় নাই। স্বর্ণকলি যেন জীবন্মৃতা!!

পরস্পরের কথার মধ্যে হরিদাসের কথাই সকলের মন অধিক আকৃষ্ট করিল। এত দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও হরিদাস আপন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, প্রকৃত পক্ষেই ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার! বলরাম ও শ্রীনাথ, হরিদাসকে প্রণাম করিলেন। সেবা ও লীলা উভয়ে স্বর্ণকলির স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিতা হইয়াছেন। স্বর্ণকলি যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতি, নিষ্কণ্টক ফুলের মধুর সুষমা, ক্ষীরের কোমল নবনী, জীবনের অনুপম সার। বিলাসের নাম গন্ধও নাই,—ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিনয়-ভূষণে দেহ মন সদা অবনত। সর্ব্বাঙ্গে যেন পবিত্রতার ছায়া প্রতিবিম্বিত। এই স্বর্গীয় আদর্শ মূর্ত্তি দেখিয়া সেবা ও লীলা বিস্মিতা

হইলেন, স্বর্ণকলির শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অতিপূর্ব্বে সেবার সহিত স্বর্ণকলির দুই এক দিন সাক্ষাৎ ছিল। স্বর্ণকলি উভয়কে অকৃত্রিম স্নেহে অভিবাদন করিলেন।

এখন আমরা পাইলাম তিন পুরুষ, তিন রমণী। তিন পুরুষ পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিলেন, অধিনায়ক হইলেন হরিদাস। তিন রমণী পরস্পরের সহিত মিলিলেন, অধিনায়িকা হইলেন—স্বর্ণকলি। অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম মিলিয়াছে—ভাবের সহিত; প্রেম ও বিশ্বাস মিলিয়াছে চরিত্রের সহিত। তিন পুরুষ মিলিয়া যেনধর্ম্মের বহিপ্রাঙ্গণ রচনা করিলেন, তিন রমণী মিলিয়া যেন ধর্ম্মের অন্তঃপুর বা মাতৃধাম রচনা করিলেন।

ইঁহারা পুরীর যাত্রী,—প্রচলিত প্রথানুসারে পঞ্চ তীর্থের সকল স্থান পরিদর্শন করিলেন। সরল বিশ্বাস, এত কালের সঞ্চিত পাপরাশি যেন বিধৌত হইয়া গেল। দোললীলা শেষ হইলে ইঁহারা সকলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দাস্তার রাজ্যের ভার তাঁহার প্রধান শিষ্যের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, কাজ বেশ চলিতেছে। সোনাপুরের অতিথি-আশ্রম বিশ্বনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে সুন্দর চলিতেছে; কিন্তু দেবী স্বর্ণকলির অন্তর্ধানের পর লোক সমাগম খুব কমিয়া গিয়াছে। শ্রীনাথের শরীর এখনও কাতর—সুতরাং চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য বলরাম ও হরিদাসকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতে হইল। শ্রীনাথের রাজভবনে স্বর্ণকলি যাইতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হরিদাসকে বলিলেন, "দাদা, আমরা দরিদ্র, আমাদের কুঁড়েঘরে থাকাই ভাল।" সুতরাং হরিদাস সামান্য খোলার ঘরে বাসা করিলেন। বলরাম হরিদাসের আকর্ষণে খোলার ঘরেই রহিলেন, শ্রীনাথের ভবনে একা শ্রীনাথ! হরিদাস ও বলরাম প্রাণ-পণে শ্রীনাথের শুশ্রূষা করিতেছেন! স্বর্ণকলি আর শ্রীনাথের রাজপ্রাসাদে যায় না! হরিদাস ও বলরাম অনেকবার স্বর্ণকলির মনের কথা বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু স্বর্ণকলি উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলেন নাই, এখনও বলিতে পারিলেন না। কেবল এই এক কথা বলিয়াছেন—"আমার প্রাণ গেলেও সে কথা বলিব না।"

ক্রমে শ্রীনাথ সুস্থ হইলেন; কিন্তু দ্বিজাত্মা হইলেন না, শরীর সুস্থ, কিন্তু মনের ব্যাধি যায় নাই, আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই। হরিদাসের দারুণ অর্থ-কষ্ট,—কিন্তু তবুও শ্রীনাথের অর্থ স্পর্শ করেন না। শ্রীনাথ অনেকবার

টাকা কড়ি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, কিন্তু স্বর্ণকলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরিদাস তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্বর্ণকলি বলেন,—"দাদা হরির যদি ইচ্ছা হয়, আমরা অনাহারে মারা যাই, তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে?" হরিদাস প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বাহির হন, যাহা পান, তাহাতে স্বর্ণকলি, লীলা, সেবা ও বলরাম সকলেরই অতি কষ্টে চলে! বলরাম রাজা হইয়াও ভিক্ষুক। এইরূপ কষ্টে তাঁহার কোন কষ্টই নাই।

দিন দিন শ্রীনাথের মন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বন্ধুদের বিরুদ্ধেব নানা কথা রামানন্দ ও দীননাথ তাঁহাব কাণে তুলিতেছে। "হরিদাস অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ স্পর্শও কবিবেন না," ক্রমে এই কথা অতি বিকৃত ভাবে রামানন্দ ও দীননাথ শ্রীনাথের কাণে তুলিল। কাজেই ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীনাথের মন ভাঙ্গিতে লাগিল। রামানন্দ, দীননাথ ও শ্রীনাথ এক পক্ষে,—এ পক্ষ অতি প্রবল পক্ষ। বলরাম ও হরিদাস অন্য পক্ষে, এ পক্ষ কলিকাতায় নিতান্ত দুর্ব্বল। রামানন্দ ও দীননাথ, শ্রীনাথকে একেবারে মাতাইয়া তুলিল। এই তিনের লক্ষ্য, তিনেব বাসনাই এক পথ গামী। স্বর্ণকলিব বিরুদ্ধে আবার বিষম সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শ্রীনাথ এবার আর মনেব কথা গোপন রাখিলেন না। একদিন হরিদাসের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলেন,—"হরিদাস বাবু, আমি স্বর্ণের নিকট বড়ই অপরাধী আছি, আমি তাহাকে এক দিন বলিয়াছিলাম যে, তোমার দাদা আমার সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।"

হরিদাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ মিথ্যা কথা তুমি কেন বলিলে? আমি ত কখনও তোমাকে এমন কথা বলি নাই।

শ্রীনাথ।—বল নাই, কিন্তু এ প্রস্তাবে আপত্তি কি? কুল ভাঙ্গিতে তুমি অনেক দিন প্রস্তুত আছ, জানি। বাল্যকাল হইতে এজন্য আমি স্বর্ণকলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছি। স্বর্ণকলির জন্যই আমি এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। সকল আয়োজন হইয়াছে, এখন তোমার সম্মতি হইলেই হয়!

হরিদাস বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—ভগ্নীর মত কি?

শ্রীনাথ।—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি চলিবেন না, প্রতিশ্রুতা আছেন।

হরিদাস।—এ সম্বন্ধে এখন আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না। পরে এ প্রশ্নের উত্তর দিব।

এই কথা বলিয়া হরিদাস উঠিয়া আসিলেন, পথিমধ্যে ভাবিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, মানুষ এতদূর স্বার্থের দাস !! শ্রীনাথের সকলই ভণ্ডামি !! যত কার্য্য করিয়াছে, সবই অভিসন্ধিময় !" শ্রীনাথের কলুষিত মনের কথা ভাবিতে ভাবিতে হরিদাসের প্রাণে দারুণ বেদনা হইতে লাগিল।

হরিদাস বাসায় আসিলেন, মুখ মলিন, কেমন যেন একটা চিন্তার ছায়া সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়াছে। হরিদাসের হৃদয়ে ভযানক যাতনা উপস্থিত।

বাসায় আসিয়া বলরামের নিকট সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া বলরামের চক্ষু স্থির! কি ভয়ানক কথা! বলরাম ঘৃণায় ও ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইলেন,—শ্রীনাথকে লক্ষ্য করিয়া অনেক গালাগালি দিলেন। হরিদাস ইহার পর স্বর্ণকলির নিকটও একথা বলিলেন। কথা শুনিয়া স্বর্ণকলির দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল, কোন কথারই উত্তর দিলেন না। হরিদাস বুঝিলেন, স্বর্ণকলির মত নাই। আরো বুঝিলেন, এই জন্যই স্বর্ণকলি বিষাদে মলিনা। বলরাম আরো বিরক্ত হইলেন। হরিদাস গম্ভীর চিন্তার মধ্যে পড়িলেন।

হরিদাস যথাসময়ে শ্রীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,— "তোমার অবৈধ প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিতে পারি না। এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তুমি বন্ধুত্বের বিরোধী কথা বলিতেছ।"

শ্রীনাথ এ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—আমার প্রস্তাব অবৈধ কিসে? সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। স্বর্ণকলি আমার এখানে অনেক দিন ছিল, পুরীতে একত্র গিয়াছিল, এজন্য, বাজারে জনবর, স্বর্ণকলি আমার সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছে। একথাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

হরিদাস বলিলেন, লোকের কথা আমি শুনিতে চাহি না,—তুমি কি স্বর্ণকে ভ্রষ্টা মনে কর?

শ্রীনাথ না ভাবিয়াই বলিলেন,—"করি বই কি, এখন বিবাহ করা ভিন্ন আর উপায় নাই!"

হরিদাস খুব বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কোন রূপ ক্রোধপূর্ণ কথা না বলিয়া বলিলেন,—"আমি একথা বিশ্বাস করি না। তোমার পায়ে ধরি, ভগ্নীর

চরিত্রে আর কলঙ্ক আরোপ করিও না। তুমি কি জান না,—ইহার পরিণাম কি? তুমি কি জান না, স্বর্ণকলির জীবনের অপবাদ কোন রূপেই স্থায়ী হয় না? কেন বৃথা চেষ্টা কর; মিথ্যা কখনও টিকিবে না?

শ্রীনাথ বলিলেন,—আমি দেখিতেছি, সত্য কথার অনেক শত্রু। আমি সে জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। আমি স্বর্ণকলিকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছি, তোমাদের সহিত আর বন্ধুত্ব রাখা দায়! আমি প্রতিজ্ঞা-পত্রের কথা প্রত্যাহার করিতেছি।

এই সকল কথা শুনিয়া হরিদাসের মন কি প্রকার অস্থির হইল, ব্যক্ত করা অসাধ্য। সমস্ত সৌরজগৎ যেন তাহার মাথার উপর বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া বাসায় আগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীনাথের চক্রান্তে !

হরিদাস খুব চিন্তিত হইলেন। বাসায় আসিয়া বলরামের নিকট সকল কথা বলিলেন। বলরাম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—আমি জীবিত থাকিতে কখনই শ্রীনাথের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে না। এই দিন হইতে বলরাম ও হরিদাস শ্রীনাথের পরম শত্রুর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তিনি বিবিধ উপায়ে এই দরিদ্র বন্ধুদ্বয়কে লাঞ্ছনা করিতে চেষ্টা করিলেন। অর্থের সাহায্যে কলিকাতায় সুসিদ্ধ করা যায় না, এমন কাজ নাই। পর দিন কলিকাতার বড় বড় সংবাদ পত্রে শ্রীনাথ প্রকাশ করিলেন যে, "সোনাপুরের হত্যাকাণ্ডের পলাতক আসামীদ্বয় কলিকাতা নগরের ৫নং হাড়কাটা গলিতে আছে।" পুলিস কমিসনারের নিকটও শ্রীনাথ এ সংবাদ পাঠাইলেন। পুলিস মহলে সাড়া পড়িল। আসামী গ্রেপ্তার করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। বেলা ১২টার সময় বলরাম ও হরিদাস সংবাদ পত্রের কথা শ্রবণ করিলেন এবং পুলিস যে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, ইহারও সংবাদ পাইলেন। শ্রীনাথ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু বল-

রাম প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গেন নাই। হরিদাসের প্রধান সহায় এখন বলরাম।

বলরাম বুঝিলেন, আর সময় নষ্ট করার সময় নাই। তিনি ব্যাকুল চিত্তে হরিদাসকে বলিলেন,—"ভাই, চল আমরা পলায়ন করি।" হরিদাস বলিলেন, "সকলের পক্ষে পলায়ন করা কি এখন সোজা ব্যাপার? কোথা-য়ই বা যাব? বলরাম আপনার রাজ্যের কথা বলিলেন। হরিদাস বলিলেন যে, "সেখানে যাইতে আমার বা স্বর্ণের ইচ্ছা নাই। তুমি এখন দেবতা, কিন্তু আবার কি দস্যুবৃত্তিতে নিযুক্ত হইবে?"

বলরাম।—আমি কি সাধে দস্যুর কাজ করিয়াছি? গরীবদের ফাঁক দিয়া ধনীরা কিনা করিতেছে! যা'ক্, অবৈধ দস্যুর কাজ করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই, কিন্তু শ্রীনাথের প্রতিশোধ না দিতে পারিলে আমার জীবনের কার্য্য পূর্ণ হইবে না, নিশ্চয় জানিবে।

বলরামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শ্রীনাথের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, বলিলেন,—ভাই, এমন কথা বলিওনা,—শ্রীনাথ তার ধর্ম্ম পালন করে নাই বলিয়া, আমরা কেন না করিব? পৃথিবীই ত মানুষের লক্ষ্য নয়,—পরলোকের কথা একবার ভাব। সেখানে ধর্ম্ম, অধর্ম্মের পুরস্কার হইবে।

বলরাম বলিলেন,—তা জানি। কিন্তু পাপী শাস্তি না পাইলে পৃথিবীর মঙ্গল নাই। অত্যাচারীর দণ্ডবিধান একান্ত প্রয়োজন। তুমি থাক, আমি চলিলাম।

বলরাম আর অপেক্ষা করিলেন না। হরিদাসের সহিত লীলা ও স্বর্ণকলি রহিলেন। সেবা স্বর্ণকলির ভালবাসার আকর্ষণ ছাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন বটে, কিন্তু বলরামের ন্যায় উপকারী বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না;—তিনিও পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বলরাম ও সেবা কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন।

হরিদাস নিশ্চিন্ত—মনে করিতেছেন, যত বিপদ থাকে আসুক। স্বর্ণকলি দাদার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছেন। বুঝিবা দাদার জীবন এতদিন পর যায়! স্বর্ণকলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন।

হরিদাস ভাবিতেছেন, "যত বিপদ উপস্থিত হয়, হউক। জীবনে ত কোনই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই, অথচ পাপের বোঝা কতই ভারি করিয়াছি! ভগ্নীর মনের দাগ একেবারে মুছিতে পারি নাই! ভগ্নীর চক্ষের নিকট চিরকালের জন্য অপরাধী আছি। আর ধর্ম্মের নিকট?

ধর্ম্মের কাছে—চির অপরাধী। আমার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! এক সময়ে মনে করিয়াছিলাম,দরিদ্রের সেবা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু তাহা এ জীবনে হইল না। অর্থাভাবে কোন ব্রতই উপযুক্তরূপ পালন করিতে পারিলাম না! এখন এ দেহ পরিত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় নাই! আমার এ অসার জীবন ধারণে আর প্রয়োজন কি? যার জীবনের কোন কাজ নাই, সে মরিবে না কেন?"

হরিদাস আবার ভাবিলেন,—"আমি ধরা দিলে স্বর্ণকলির ও লীলার উপায় কি হইবে, কে ইহাদিগকে আশ্রয় দিবে? তায় আবার প্রবল শত্রুপক্ষ সম্মুখে! আমি ধরা দিলে, বলরামের গতিই বা কি হইবে? বলরাম কি আমাকে মরিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? না জানি, সে শ্রীনাথকে লইয়া কি বিষম অনর্থ উপস্থিত করে! তবে এখন কি করি? ভাবিয়া কূল কিনারা না পাইয়া স্বর্ণকলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণের বোন্, সবই ত শুনিয়াছ, আর সময় মাত্র নাই। এখন কি করি? ধরা দিব কি? ধরা দিলে বলরামের মৃত্যু নিশ্চয়!

স্বর্ণকলি বলিলেন, দাদা, ভাবনা করিও না, তোমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, হরির নাম স্মরণ কর, তিনি বিঘ্ন-বিনাশন, তিনি সকল বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আজও করিবেন। যদি উদ্ধার নাও করেন, তাতেই বা ভাবনা কি? তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই জীবন—তাঁরই ইচ্ছার ফল, মৃত্যু আসে তাঁরই ইচ্ছাতে আসিবে। চিন্তা না করিয়া তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকাই আমার মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

হরিদাস স্বর্ণকলির নির্ভরের কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। আর উপায় নাই, সুতরাং বিশ্বাসে না কুলাইলেও নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল। এ দিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেক লোক বাড়ী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শ্রীনাথ, রামানন্দ ও দীননাথ পুলিসের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন! শ্রীনাথ হরিদাসকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইহারই নাম হরিদাস, ইনিই সোনাপুরের হত্যাপরাধে অপরাধী।"

পুলিসের প্রধান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "বলরাম কোথায়? সে-ই প্রধান আসামী, তাহাকেও চাই।"

শ্রীনাথ বলিলেন, ইনিই হত্যা করিয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

পুলিস আর এত গোলযোগের ভিতর গেল না, শ্রীনাথকে বলিল,- "বলরাম কোথায় ?"

শ্রীনাথ আবার বলিলেন,—"ইনি সকলই জানেন।"

পুলিস হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল বলরাম কোথায় ?

হরিদাস বলিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না।

পুলিস তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি হরিদাস ? তোমার বাড়ী কি সোনাপুর ?

হরিদাস।—আমিই সোনাপুরের হরিদাস।

পুলিস।—তুমি নর-হন্তা হরিদাস ?

হরিদাস।—আমিই নর-হন্তা হরিদাস।

পুলিস।—বলরাম ও তুমি মিলিত হইয়া হত্যা করিয়াছিলে ?

হরিদাস একটু ভাবিয়াই বলিলেন, বলরাম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—আমিই নরহন্তা !

পুলিস।—তবে বলরাম আসামী হয়েছিল কেন ?

হরিদাস।—আপনাদের অনুগ্রহে !

পুলিস।—সে কেন অপরাধ স্বীকার করেছিল ?

হরিদাস।—আমাকে বাঁচাইবার জন্য।

একজনকে বাঁচাইবার জন্য অন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় বিরল ; সুতরাং পুলিস একথা বিশ্বাস করিল না। মনে ভাবিল, ইহাকে গ্রেপ্তার করিলেই সমস্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবিয়া শ্রীনাথের উত্তেজনায় পুলিস হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিল। স্বর্ণকলি ও লীলা—উভয়ই শত্রুর হস্তে পতিতা হইলেন।

হরিদাস যাইবার সময় স্বর্ণকলিকে বলিলেন, বোন্, হরির উপর নির্ভর করিয়া থাক, কোন ভয় নাই।

স্বর্ণকলি কোন উত্তরই করিলেন না। আপনার পরিণাম ভুলিয়া দাদার পরিণাম চিন্তা করিয়া অধীরা হইলেন। পুলিসের লোক হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিল। স্বর্ণকলি ও লীলা—এখন শত্রুবেষ্টিত বন্ধুহীন কলিকাতা মহাশ্মশানে নিরাশ্রয়া হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিক যেন বিপদের মেঘ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কে ইহাদের পরিণাম ভাবিতে পারে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আনন্দে বিষাদ !

এ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে লিখিয়াছি, আর লিখিতে ইচ্ছা করে না। জন্ম-দুঃখিনী স্বর্ণকলির জীবনে এতও ছিল। একে একে তাঁর সকল দিক আঁধার হইয়া আসিয়াছে,—আর রাখে কে, আর আশ্রয় দেয় কে? হায়, হায়, তবে বুঝি স্বর্ণকলি এবার ডুবে!

শ্রীনাথ এবার প্রাণপণ করিয়া লাগিলেন। হরিদাসের মকর্দ্দমা কাজেই পাকিয়া উঠিল। "চোরে চোরে মাসতুত ভাই",—রাজা রাজ্‌ড়ারা সকলেই ধনীর বংশ—সুতরাং এবার আর রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। হরিদাস কোন রকমেই যখন বলরামের ঠিকানা প্রকাশ করিলেন না, তখন হরিদাসকেই পুলিস চালান দিল। সময়োপযোগী সাক্ষী সংগ্রহ করিতে আর কত সময় লাগে? শ্রীনাথের চেষ্টায় অনেক সাক্ষী সংগ্রহ হইল। সোনাপুর যে জেলায় স্থাপিত, সেই জেলাতেই হরিদাসের বিচার হইল। বিশ্বনাথ রায় বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। শ্রীনাথের চক্রান্তের হস্ত হইতে হরিদাস কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইলেন না। বিচারে হরিদাসের দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। হরিদাস নীরবে বীরের ন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

হতভাগিনী স্বর্ণকলি ও লীলা এখন দীননাথ জ্যোতির্বীর বাড়ীতে নীতা হইয়াছেন। তাঁহারা হরিদাসের দ্বীপান্তরের আদেশের কথা শুনিয়াছেন। স্বর্ণকলির চক্ষের জলে ধরা সিক্ত হইয়া যাইতেছে; দাদার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মলিন হইয়া গিয়াছেন! তার উপর অত্যাচার! অত্যাচারের আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। মানুষকে ডুবাইবার জন্য মানুষ যত উপায় আবিষ্কার করিতে পারে, সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে! কোন উপায়েই কিছু না হওয়ায় এখন বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার আয়োজন হইয়াছে। জনরব এইরূপ, লীলার সহিত রামানন্দের এবং স্বর্ণকলির সহিত শ্রীনাথের বিবাহ হইবে। শ্রীনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দীননাথের হৃদয়-চাঁদ সেবাকে আবার দীননাথের হৃদয়ে বসাইয়া দিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া অবধি স্বর্ণকলি ও লীলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে! যেখানে ক্রোধ বা ঘৃণার লেশ মাত্র ছিল না, সেখানে একটু একটু ক্রোধ ও ঘৃণার

উদয় হইতেছে! স্বর্ণকলি বুদ্ধিমতী, কিন্তু তিনিও আর উপায় দেখিতে-ছেন না। একে দাদার দ্বীপান্তরের সংবাদ, তাহার উপর আবার এই নিদারুণ সংবাদ! মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে? রমণীর ন্যায় সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি এ জগতে আর নাই। কিন্তু সহিষ্ণুতারও ত সীমা আছে। স্বর্ণকলি আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না! মন প্রাণ বিকল হইয়া উঠি-তেছে। শ্রীনাথের দাসদাসী আসিয়া দুবেলা স্বর্ণকলির সংবাদ লইয়া যাইতেছে,—কত খাবার আসিতেছে, কত প্রকার জিনিস আসিতেছে, কতরূপ পোষাক পরিচ্ছদ আনিয়া প্রলোভন দেখান হইতেছে। কিন্তু স্বর্ণকলি এ সকল কিছুতেই মন দিতেছেন না! "এমন মেয়ে ত আর দেখি নাই,—রাজা স্বামী হবে, এতেও মন উঠে না"—দাসীরা এইরূপ কত টিট্‌কারী দিয়া বিরক্ত হইয়া যাইতেছে! স্বর্ণকলি টাকা কড়ি, গাড়ী ঘোড়া, দাস দাসী, ধন ঐশ্বর্য্য—এ সকলের কিছুই চান না.—তিনি কেবল দরিদ্রের সেবা করিতে চান!—এ অমানুষিক মহত্বের মর্ম্ম কে বুঝিবে? স্বর্ণের মন আজ কাল বড়ই উচাটন! সঙ্গিনী এক মাত্র লীলা, পরামর্শের একমাত্র স্থল লীলা। লীলা স্বর্ণকলির মহত্বের পরিচয় পাইয়া মোহিতা হইয়াছেন। তিনি ভাবিতে-ছেন—"এমন সঙ্গিনী যার ভাগ্যে জুটে, তার আর দুঃখ কি? মরণেও তার কষ্ট নাই!"

স্বর্ণকলি লীলার মন বুঝিবার জন্য আজ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—বোন্, সবই ত শুনেছ, দাদা দ্বীপান্তর যাইতেছেন,—এদিকে তোমার আমার কপাল পোড়াইবার আয়োজন হইয়াছে, এখন করিবে কি?

লীলা।—চলনা আমরাও তোমার দাদার সহিত যাই?

স্বর্ণকলি।—কঠিন অপরাধ না করিলে যাইতে দিবে কেন?

লীলা।—এস না আমরাও মানুষ খুণ করিয়া দ্বীপান্তরে যাই!

লীলা আর কিছু বুঝেন না, আর কিছু জানেন না। হরিদাসকে পাইবার জন্য তিনি সবই করিতে পারেন! তাই বলিলেন, এস না আমরাও খুণ করি!

লীলার কথায় স্বর্ণকলি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন, বলিলেন, খুণ করিবি? তুই কি রাক্ষসী?

লীলা বুঝিলেন, বড় অন্যায় কথা বলিয়াছেন, বলিলেন, ক্ষমা কর, না বুঝিয়া এমন কথা বলিয়াছি। এস, আমরা নিজেরা মরি!

স্বর্ণকলি আরো বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, ছি, এমন কথা মুখেও

আনিতে নেই। শাস্ত্রে আছে, আত্মহত্যার ন্যায় আর পাপ নাই। যে আত্মহত্যা করে, তার জন্য শোক করা পর্য্যন্ত নিষেধ। তার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হয় না। এমন পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ছি, এমন কথা মুখেও আনিস্‌নে।

লীলা এবারও বুঝিলেন, গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। স্বর্ণকলির বিরক্তি সামান্য কারণে হয় না। লীলা এবারও ক্ষমা চাহিলেন, এবং বলিলেন,— "আমিত আর উপায় দেখি না, তুমি কি করিতে বল ?

স্বর্ণকলির উত্তর মুখে মুখে ছিল, বলিলেন, বোন্, অধীর হ'ও না। আমার প্রতিজ্ঞা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরির উপর নির্ভর করিয়া থাকিব। যিনি শত শত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় জানি, তাঁর কৃপায় আমাদের সকল বিপদ হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইব। আর যদি নিষ্কৃতি না পাই, তাতেই বা ভয় কি ? তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। যা ঘটিবার ঘটুক।

লীলা স্বর্ণকলির কথায় আশ্বস্ত হইলেন। আর করিবেনই বা কি ? উপায়ই বা কি আছে ?

যথা সময়ে হরিদাসের দ্বীপান্তরের আদেশ হাইকোর্ট হইতে বহাল হইল। হরিদাস কলিকাতার আলিপুর জেলে আনীত হইলেন। জাহাজের অপে-ক্ষায় তাঁহাকে রাখা হইল! জন্মের মত একবার স্বর্ণকলিকে দেখিয়া যাইবেন, এই আশ্বাস আছে। দেখা করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রীনাথ বাবু চক্রান্ত করিয়াছেন যে, জাহাজ ছাড়িবার দিন ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে না। টাকার অসাধ্য কি ?

দেখিতে দেখিতে সর্ব্বনাশের দিন আগমন করিল। আজ রামানন্দ স্বামী ও শ্রীনাথ বাবুর বিবাহ হইবে। খুব ধুমধাম পড়িয়াছে। গান বাজনায় শ্রীনাথ বাবুর বাড়ী পরিপূর্ণ। কলিকাতার গণ্য মান্য সকল লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সকলেই শুনিয়াছেন যে, শ্রীনাথ বাবু বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতেছেন ; কিন্তু খাতিরে কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। পরন্তু সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আগমন করিয়াছেন। গাড়ী ঘোড়া গিস্ গিস্ করিতেছে। গ্যাসের আলোতে বাড়ী আলোকিত। শাল পাগ্‌ড়ী ও চোগা-চাপকান-পরিধায়ী, ঘড়ি-চেন-পরিশোভিত গণ্য মান্য লোক সমাগমে আনন্দের বাড়ী পরিপূর্ণ। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল. ক্রমে

আকাশের চাঁদ ডুবিল! চাঁদ ডুবিল, বুঝি বা সেই সঙ্গে চিরকালের জন্য স্বর্ণকলির জীবনও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়!

বরের গাড়ী সজ্জিত হইয়া দ্বারে লাগিয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে সারি সারি ২০০। ৩০০ শত ব্রুহ্যাম, চেরিয়ট, বগী, পাল্কী গাড়ী উৎকৃষ্ট সাজ-সজ্জায় শোভা পাইতেছে। সকল গাড়ীতেই বাতি জ্বলিতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সুসজ্জিত পরিচ্ছদে সোলা-নির্ম্মিত বাতির ঝাড়, নিশান, নানা রূপ রাজদণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান। দুঃখিনী স্বর্ণকলির কপাল ভাঙ্গিবার জন্য সমস্ত কলিকাতা যেন আজ দল বাঁধিয়াছে!

বর গাড়ীতে উঠিলেন। দীননাথের বাড়ীতে বিবাহ হইবে। বাড়ীটি খুব প্রকাণ্ড নয় বলিয়া লোকজনের জন্য পার্শ্বে আর একটী বড় বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। সেই বাড়ী লক্ষ্য করিয়া বরের গাড়ী চলিল। সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া, লোক জন—সহস্র সহস্র চলিয়াছে!

রাত্রি চারি দণ্ডের পর, বরের গাড়ী রওয়ানা হইয়াছে, দীননাথের বাড়ীতে এই সংবাদ আসিল। বাড়ীর লোক জন, চাকর বাকর সব রাস্তায় যাইয়া বরের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইল। দীননাথ, রামানন্দ—এবং এ পক্ষীয় প্রায় সকলেই রাস্তায়। এমন সময়ে হঠাৎ অবারিত দ্বার দিয়া এক দল ভদ্র বেশধারী দস্যু বাড়ীর ভিতর বরযাত্রী রূপে প্রবেশ করিল। চোরের উপর বাটপাড়ী করা বড় সহজ। বরযাত্রী আসিতেছে ভাবিয়া কেহই কোন উচ্চ বাচ্য করিল না। উচ্চ বাচ্য করিবেই বা কে? প্রায় সকলেই বড় রাস্তায়। নিমেষের মধ্যে দস্যুর দল বাড়ীতে ঢুকিয়া পূর্ব্ব সন্ধানানুসারে স্বর্ণকলি ও লীলার ঘরে ঢুকিয়া তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিল। লীলা ও স্বর্ণকলি উদ্বিগ্ন চিত্তে পরিণাম ভাবিতেছিলেন;—আচম্বিতে এই ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা দ্বিরুক্তি করিলেন না, দ্বিরুক্তি করিবার সময়ও ছিল না, এবং ইচ্ছাও ছিল না। আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেই হয়, ইহা যাঁহাদের ইচ্ছা, তাঁহারা আর দ্বিরুক্তি করিবেই বা কেন? স্বর্ণকলি ও লীলাকে লইয়া নিমেষের মধ্যে দস্যুর দল অন্তর্হিত হইল।

এদিকে রাস্তায় আর একটি ঘটনা ঘটিল। কলুটোলা রাস্তা দিয়া যখন বরের গাড়ী যাইতেছে, তখন আচম্বিতে একটা রিভলভারের শব্দ শ্রুত হইল! শব্দের পরই শ্রীনাথ একটা চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন! চতুর্দ্দিকে এত লোক যে কাহার দ্বারা এই কাজ হইল, নির্ণয় করা বড়ই কঠিন।

অনুসন্ধানে দেখা গেল, রিভলভারটা রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ এই ঘটনায় চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল। ধর্ ধর্, মার্ মার্ শব্দ চতুর্দ্দিকে। কিন্তু কে কাহাকে ধরে, কে বা কাহাকে মারে! সব যেন ভোজের বাজি!

ভাড়া করা আত্মীয়েরা বেগতিক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন-তৎপর হইল। পুলিসের দালালির চোটে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, দীননাথ ও রামানন্দের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। দুই দশজন লোক ভিন্ন সকলেই পলায়ন করিল। এ সকল সাজসজ্জার দায়িত্ব কণ্ট্রাক্টারের, সুতরাং বর পক্ষের কোন লোক ইহাতে উচ্চবাচ্য করিল না। শ্রীনাথকে সেই অবস্থায় গৃহে আনয়ন করা হইল। ক্রমে সকলে শুনিয়া অবাক হইল যে, একই সময়ে কন্যাও অপহৃতা হইয়াছেন। কেন এরূপ ঘটিল, অন্য কেহ বড় একটা ইহা নিরুপণ করিতে পারিল না। রামানন্দ বুঝিলেন, বলরামেরই এ সকল চক্রান্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বলরামের প্রেম আলিঙ্গনে।

শ্রীনাথ বাবু সাংঘাতিক আঘাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। ৭ দিবসের মধ্যে তার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। সোণার পুরীতে হাহাকার করিতে ছিল—কেবল দাসদাসী—তাহারা সাধ্যানুরূপ হাহাকার করিল। শ্রীনাথের লীলা এইরূপে শেষ হইল। শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া অনেকেই অশ্রু ফেলিলেন; কিন্তু রক্ষা করিবে কে? কালের দুর্জ্জয় কবলে শ্রীনাথের যত্নের শরীর বিসর্জ্জিত হইল। শ্রীনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে ইংরাজীতে উইল করিয়া তাহা রেজেষ্টারি করিয়াছিলেন।

"আমি নরাধম, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী, সকলই। আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যে দেবীকে পাইবার জন্য আমি এই ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়াছিলাম, এই ঐশ্বর্য্য সেই দেবীর নামেই উৎসর্গ করিলাম। তাঁহার বড় আক্ষেপ ছিল, আমার বাড়ীতে একদিনও দরিদ্র এক মুষ্টি অন্ন পায় নাই। সে আক্ষেপ ঘুচাইবার জন্য আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেবী স্বর্ণকলির অনাথ-আশ্রমের জন্য ব্যয় হইবে। এ পৃথি-

বীতে যাহাদের মুখের দিকে চাহিতে আর কেহ নাই, এমন বিপন্ন নর নারী জাতি নির্ব্বিশেষে স্বর্ণকলির অনাথ-আশ্রমে স্থান পাইবে।

আমার বন্ধুদিগের মধ্যে হরিদাস এবং বলরাম প্রধান, কিন্তু উভয়ের প্রতিই আমি কঠোর ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহাদের একজন নির্ব্বাসিত, একজন পলাতক, সুতরাং ট্রষ্টি হইবার যোগ্য লোক আর দেখি না। এজন্য আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিলাম। আমার মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট আমার বিত্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন।

আমি জীবিত থাকিলে এ বিষয় যাঁহার হইত, সেই দেবী স্বর্ণকলির ইচ্ছা হইলে তিনিই এই আশ্রমের অধিনায়িকা নিযুক্তা হইবেন। তাঁহাকে না পাওয়া গেলে; হরিদাস বাবু যদি কখনও খালাস হন, তবে তিনিই অধিনায়ক হইবেন।"

শ্রীনাথের মৃত্যুর পর উইলানুসারে বিত্ত সম্পত্তি সমস্ত গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিলেন। দীননাথ ও রামানন্দের জীবনের আশা একেবারে নির্মূল হইল। ইঁহাদের আশা ছিল, শ্রীনাথ বাবু তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না,—অন্তত সেবাকে উদ্ধার করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কতক টাকা দিয়া যাইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আশা কোন রূপেই পূর্ণ হইল না। শ্রীনাথ বুঝিয়াছিলেন, রামানন্দ ও দীননাথের ন্যায় ঘৃণিত লোকদিগের নরকেও স্থান পাওয়া উচিত নয়। তিনি বিষয়ের এক কপর্দ্দকও তাহাদিগকে দেন নাই। শ্রীনাথের ব্যবহারে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন, এবং জীবনের উদ্দেশ্য কোন রূপেই সিদ্ধ হইল না বলিয়া, মনে অভিনব অভিসন্ধি লইয়া, পুলিসের সহিত অনেকরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনাথ বাবু নগদ টাকা কতক দাস দাসীদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা বাদে আর সমস্ত ঐশ্বর্য্য গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিলেন। গবর্ণমেণ্ট উইলানুসারে শ্রীনাথের বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি দ্রব্যাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট কাগজে পরিণত করিলেন। হরিদাস মুক্ত হইলে বা স্বর্ণকলিকে পাওয়া গেলে কোম্পানির কাগজের আয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইল।

দুর্দ্দান্ত বলরাম প্রতিশোধের জীবন্ত অবতার। হরিদাস ও স্বর্ণকলিকে ফেলিয়া আপন রাজ্যে গমন করিলেন। সেখান হইতে বহুলোক সংগ্রহ

করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তারপর শ্রীনাথের বিবাহের দিন যে কাণ্ড করিলেন, তাহা বলিয়াছি। হরিদাসকে উদ্ধার করিবার জন্য, এবং শ্রীনাথের পরিণাম দেখিবার জন্য তিনি কয়েকদিন কলিকাতায় রহিলেন। হরিদাসের দ্বীপান্তর গমন ও শ্রীনাথের পরলোক গমনের পর স্বর্ণকলি ও লীলাকে আপন রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। বলরাম অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরিদাসকে কোন রূপেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না। দুর্দান্ত ইংরাজের হস্ত হইতে হরিদাসকে ছিনাইয়া লইতে বলরাম পরাস্ত হইলেন। হরিদাস আণ্ডামান দ্বীপে প্রেরিত হওয়ার পরও বলরাম কয়েক দিন কলিকাতায় রহিলেন। গঙ্গার ঘাটে শ্রীনাথের আদ্য শ্রাদ্ধের দিন অনেক টাকা কড়ি দান করিলেন, এবং তৎপর আপনরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু স্বর্ণকলির সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। মধুবনের নিকটস্থ হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, স্বর্ণকলি কিছু দিন হইল কোথায় গিয়াছেন, অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীনাথের হত্যা এবং হরিদাসের দ্বীপান্তর গমনের সংবাদ তাঁহাকে যে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়াছে, তিনি তাঁহার পরাক্রম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। দাস্তার রাজ্যে দুই দিন মাত্র ছিলেন,—দুই দিন মাত্র লীলা ও সেবার সহিত প্রাণের কথা বলিতে অবসর পাইয়াছিলেন। লীলা ও সেবা সাধ্যানুসারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণকলি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে একাকিনী কুটীর পরিত্যাগ করেন। তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই ঠিক করিতে পারে নাই। বলরাম রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া যখন একথা শুনিলেন, তখন তিনি একেবারে অধীর হইলেন। স্বর্ণকলি এবং হরিদাসের বিচ্ছেদে তিনি এত কাতর হইলেন যে, কোন রূপেই আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। দারুণ মনোকষ্টে, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন হইয়া কোনরূপে জীবনের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

রামানন্দ স্বামী এবং দীননাথ প্রতিশোধের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বলরাম সকলের মূল। শ্রীনাথের কথায় জানিয়াছিলেন যে, বলরাম দাস্তা রূপে দীননাথের নাক কাণ কাটিয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ অবধি তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, দাস্তাই শ্রীনাথের হত্যার কারণ। প্রতিশোধ লইবার আশায় তাঁহারা পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটে আড্ডা পাতিলেন। মধুবনের নিকটেই দাস্তার নিবাস, ইহা দীননাথ

জানিতেন; কোন রূপে দাস্তাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে উভয়ের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, উভয়ের আশা। পুলিসের অনুমতি লইয়া ইহারা মধুবনে বাস করিতেছেন,—দাস্তাকে ধরিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার পাইবেন। বন্দোবস্ত হইয়াছে। যত লোকের প্রয়োজন হইবে, পুলিস সাহায্য করিবে, এইরূপ আদেশ হইয়াছে। দীননাথের যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা অনু-সন্ধানার্থ অনেক লোক নিযুক্ত করিলেন। দাস্তাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যতদূর সম্ভব, অভিসন্ধির জাল বিস্তার করিলেন।

দাস্তার লোকেরা এ সংবাদ পাইয়াছে। সেই ছিন্ন-কর্ণ সন্ন্যাসী মধুবনের নিকটে আসিয়াছে, একথা দাস্তা শুনিলেন। আরো শুনিলেন যে, পুলিসের সাহায্যে সন্ন্যাসী দাস্তাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিবেন, এইরূপে বন্দো-বস্ত হইয়াছে। ভগ্ন হৃদয় বটে, কিন্তু তবুও ইহাতে তত মনোযোগের কারণ নাই, বুঝিলেন। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে দিন যাইতে লাগিল। দাস্তা একদিন ছদ্মবেশে ইহাদের নিবাসে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ইহারা উভয়ে কত কি পরামর্শ করিতেছে। আড়াল হইতে এইরূপ কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন।

একজন বলিতেছে, "দাস্তাকে গ্রেপ্তার করা বড় সোজা কথা নয়। আমাদের এ চেষ্টা সফল হইবে না। স্বর্ণকলি, লীলা বা সেবাকে পাইবার আর উপায় নাই!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে বলিতেছে,—"শেষ পর্য্যন্ত দেখি, তারপর যা হয় হইবে।"

প্রথম ব্যক্তি।—"স্বর্ণকলি, লীলা যে দাস্তার আশ্রয়ে আছে, তাহা কেমনে জানিলে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—"শ্রীনাথ বাবু বলিয়াছেন, দাস্তা আমাদের বলরাম। বলরামই যে স্বর্ণকলি ও লীলাকে উদ্ধার করিয়াছে, এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। সোনাপুরে বলরামকে হত্যা করিবার জন্য একবার আমি তাহাকে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়াছিলাম, হরিদাস সেবা শুশ্রূষা করিয়া সেবার ইহাকে রক্ষা করিয়াছে, দেখি এবার কে রাখে?

প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে, "এখন আমাদের এ সকল বাসনা পরিত্যাগ করাই উচিত। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে!

এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া দাস্তা ইহাদের অভিপ্রায় বুঝিলেন। স্বর্ণকলির

সংবাদ না পাওয়ার দিন হইতে দান্তার মন কেমন বিকল হইয়া গিয়াছে, হৃদয় মনে একরূপ উদাসীন ভাব ছাইয়াছে। সদাপ্রফুল্ল অসভ্য কোল স্ত্রীপুরুষ প্রত্যহ মধুর নৃত্যামোদে দান্তাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহার মনের কালিমা কিছুতেই দূর হইল না। তিনি আর লুক্কায়িত ভাবে থাকিতে পারিলেন না। এক-স্রোতা প্রেমের টানে ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আর কেন ভাই, ঢের হইয়াছে, যত অন্যায় কাজ করিবার সম্ভব, সকল করিয়াও যখন শান্তি সুখ পাই নাই, তখন আর কেন?"

দান্তার সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়-ছবি দেখিয়া দীননাথ জ্যোতিষী ও রামানন্দ তীর্থস্বামীর মন বিচলিত হইল। উভয়ের মুখেই কেমন এক মধুর ভালবাসার ছবি দীপ্তি পাইল। তিন জন পরস্পর কোলাকুলি করিলেন, পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। অতীত ঘটনা সকল যেন কেমন একরূপ কল্পনা-মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সকলে আজ যেন নবজীবন পাইলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। দীননাথ ও রামানন্দ সঙ্গীয় লোক-দিগের বন্দোবস্ত করিয়া দান্তার আশ্রয়ে গমন করিলেন। সেবা, লীলা, রামানন্দ ও দীননাথ—দান্তার জীবনের সে উচ্চ আদর্শ দেখিয়া মোহিত হইলেন। কিছুদিন মিলিত ভাবে সকলে দান্তাবনে রহিলেন। রামানন্দ ও দীননাথ এখন ধর্ম্মের বাহ্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা সোজা কথা নয়, কথার কথা নয়। হৃদয় ঢাকিয়া, উভয়ে দান্তার সহিত মিলিত হইয়া অসভ্য জাতির উন্নতির জন্য সাধ্যানু-সারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাতৃধামের সম্বল।

স্বর্ণকলি উদাসিনীও নহেন, সন্ন্যাসিনীও নহেন। তিনি দস্যুর গৃহে থাকা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বাহির হইয়াছেন। দাদার বিচ্ছেদে তিনি বড়ই অধীরা হইয়াছেন। এই অস্থির অবস্থায়, কোন পরম ধার্ম্মিকের আশ্রয়ে

যাইতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে জনৈক পরম ধার্ম্মিক আছেন। সুতরাং তিনি প্রথমত বৃন্দাবনে গমন কবিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিলেন। ধার্ম্মিকবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু অল্পদিন পরেই বুঝিলেন, সেখানেও তার চরিত্র নিরাপদ নয়। সেখানেও ধর্ম্মের নামে প্রতারণা, ব্যভিচার, মিথ্যা, অসত্য প্রশ্রয় পাইতেছে, দেখিলেন। সেখানেও তাহার চরিত্র লইবার জন্য বহু লোক চক্রান্ত করিতেছে, বুঝিলেন। কথা প্রসঙ্গে, সেই পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বর্ণকলির জীবনের সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন।

"ধর্ম্ম পৃথিবীতে দিন দিনই দুর্লভ হইতেছে। সংসারই ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত স্থান, কিন্তু এখন তাহা অধর্ম্মে পরিপূর্ণ। সুতরাং বৃথা আর সংসারের দিকে চাহিও না। ধর্ম্মের দুই বিভাগ আছে—দেওয়ানে আম ও দেওয়ানে খাস। এক ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, অন্য অন্তরঙ্গ। ধর্ম্মের বাহিরের প্রাঙ্গণে ধর্ম্মের মত, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভাব বা কর্ম্ম, নাম-রুচি, পূজা বা সেবা। ভিতরের প্রাঙ্গণে অর্থাৎ অন্তঃপুরে কেবল মা ও সন্তান। বাহিরের দরবারে—সম্বন্ধের দূরত্ব আছে,—কিন্তু ভিতরে সন্তান ক্রোড়ে মূর্ত্তিময়ী গণেবজননী। বাহিরে যাহা মত, এখানে তাহা বিশ্বাস; বাহিরে যাহা ভাব, এখানে তাহা প্রেম; বাহিরে যাহা জ্ঞান, এখানে তাহা ধ্যান, সমাধি; বাহিরে যাহা সেবা বা পূজা, এখানে তাহা ভক্তি। অন্তঃপুরের ধর্ম্ম, সন্তান-ধর্ম্মের চরমলীলা। ধর্ম্মের বহিঃপ্রাঙ্গণে জগতের যাবতীয় লোক বিচরণ করিতেছে;—খোসা লইয়া অনেকেই মজিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিতেছে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, সুধু মতে ধর্ম্ম নাই; উন্মত্ততায় ধর্ম্ম নাই,—গৈরিকবস্ত্র, যোগ তপস্যা, পূজা অর্চ্চনা বা জ্ঞান কর্ম্ম, এ সকলের কিছুতেই প্রকৃত ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম—কেবল বিশ্বাস ও চরিত্রে। শিশুর ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্রচেতা হইয়া মাতৃক্রোড়ে যাঁহারা লীলাবিহার করেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক। তোমার নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছি, তাহা হইতেই দৃষ্টান্ত দিতেছি। জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে ধর্ম্ম হয় না, তাহার পরিচয় শ্রীনাথের জীবন; যোগ তপস্যায় ধর্ম্ম হয় না, তাহার পরিচয় রামানন্দ স্বামী। কর্ম্মে ধর্ম্ম হয় না, তাহার পরিচয় বলরাম। আর কেবল সৎ কার্য্যেও যে ধর্ম্ম হয় না, তাহার পরিচয় তোমার দাদা হরিদাসের জীবন। চরিত্র লাভ ভিন্ন মানুষ ধর্ম্মের অধিকারী হয় না। বাহিরের মত, ভাব, জ্ঞান, কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি

যাহা কিছু আছে, এ সকল কেবল মানুষকে প্রস্তুত করিবার জন্য, চরিত্রের অধিকারী করার জন্য। চরিত্রের অধিকারী হইলে, অর্থাৎ নির্ম্মল চরিত্র পাইলে তবে অন্তঃপুরে মাতার সহিত সাক্ষাতের অধিকার জন্মে। অতএব চরিত্রই মাতৃদর্শনের দ্বারস্বরূপ মনে রাখিবে। আমি দেখিতেছি, তোমার জীবন সেই দ্বারে উপনীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু বাকী আছে। বাহিরের আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের তাড়না, সব নির্ব্বাণ করিতে হইবে। বৈকুণ্ঠের যাত্রীর সম্বল কেবল, বিশ্বাস। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—এ সকল বিশ্বাসে মিশ্রিত না হইলে মানুষকে কেবল নরকের পথে লইয়া যাইবার সহায়তা করে। কত জ্ঞানী নাস্তিক, কত প্রেমিক ব্যভিচারী, কত কর্ম্মী নরহন্তা এই জগতে আছে, তাহার শেষ নাই। এসকল যখন বিশ্বাসের সহিত মিলিত হয়, তখনই বৈকুণ্ঠের পথ দেখাইয়া দেয়; নচেৎ নরক ভিন্ন ইহারা আর পথ চেনে না। অতএব মনে রাখিবে—বিশ্বাসের ন্যায় ধর্ম্মপথের দ্বিতীয় সহায় নাই। বিশ্বাস ভিন্ন চরিত্রের অঙ্কুর জন্মে না—বিশ্বাস ভিন্ন মানুষ মানুষ হয় না। যাহারা বিশ্বাস হীন, তাহারাই চরিত্রহীন, তাহারাই অধার্ম্মিক। বিশ্বাসই অন্তঃপুরের নেতা। মায়ে বিশ্বাস গাঢ়তর হইলে সন্তানের জন্য মাতৃভূমি অথবা ধর্ম্মের অন্তঃপুরের দ্বার মুক্ত হয়। সেই-ই শান্তিপুর, বৈকুণ্ঠ, মোক্ষ,—যাহা সুন্দর, সে সকলই। বিশ্বাস নাই, অথচ লোক ধার্ম্মিক হইয়াছে, এমন কথা শুনা যায় নাই। ধর্ম্ম নাই, অথচ লোক মনুষ্যত্ব পাইয়াছে, এমন কথাও শুনি নাই। ধর্ম্ম বা চরিত্র নাই, অথচ মানুষ জগতের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছে, এমন ঘটনা কোথাও ঘটে নাই। তুমি ধর্ম্মের বাহিরের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, অর্থাৎ চরিত্র ও বিশ্বাসের রাজ্যে পৌঁছিয়াছ,—এখন মাতৃধামে, অন্তঃপুরে যাত্রা কর। ধর্ম্মের পুরস্কার, ধর্ম্মই; চরিত্রের পুরস্কার চরিত্রই;—বিশ্বাসের পুরস্কার—মা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সাধনা চরিত্রলাভের পথ, চরিত্র বিশ্বাসের ভিত্তি। বিশ্বাস মাতৃদর্শনের নেতা। তুমি ধর্ম্ম পাইয়াছ, চরিত্র পাইয়াছ—এখন মাকে পাইলেই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে। যশ মান, বিলাস সুখ অপেক্ষা ধর্ম্ম কত মধুর, কত সুন্দর! ধর্ম্ম অপেক্ষা চরিত্র কত সরস। ধর্ম্ম ও চরিত্র অপেক্ষা মধুর মাতৃমূর্ত্তি কত সুন্দর! অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! যে মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছে, সে আর সকলরূপ ভুলিয়াছে, সে মূর্ত্তি অতুলনীয়। মাকে পাইলে আর পাইবার কিছু বাকী থাকে না।

ধর্ম্ম, চরিত্র, স্বর্গ, মোক্ষ সকল সেখানে সম্মিলিত। যে দিন মাকে পাইবে, সে দিন পৃথিবীর সব কামনা ভুলিতে পারিবে। এখনও কিছু আসক্তি আছে, তাই ভ্রাতার জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছ, মানুষের দুঃখ কষ্ট স্মরণে ব্যথিতা হইতেছ। মাকে পাইলে আর এ আসক্তি থাকিবে না, তখন তুমি অচ্যুত ধাম লাভ করিবে। সে দিন তোমার সকল বাসনা নির্ব্বাণ হইবে—সকল কামনা পূর্ণ হইবে। সে দিন তুমি অপরাজিতা নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু এই বৃন্দাবনে তাহা পাইবে না। বৃন্দাবনে ধর্ম্ম নাই—বৃন্দাবন ব্যভিচার ভণ্ডামিতে ডুবিয়াছে। কোন তীর্থেই এখন প্রকৃত ধর্ম্ম নাই। সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া তুমি আপনার আত্মার মূলে অবগাহন কর। আমি বার বার তোমাকে বলিতেছি, আত্মার মূলে অবগাহন না করিলে মাতৃ দশন পাইবে না। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কৈলাস বা চিত্রকুট পর্ব্বত,এ সকলের কোথাও যাহা মিলে না, কেবল বিশ্বাস বলে আত্মার মূলে তাহা মিলে। এই তীর্থই মহা পুণ্য তীর্থ। গোদাবরী, কাভেরী, নর্ম্মদা,ব্রহ্মপুত্র,গঙ্গা,যমুনা, সরস্বতী—আত্মার মূলে এই সকল পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বতী সর্ব্বদা প্রবাহিত। ডুবিতে ডুবিতে সেখানে যাও। যাহা পাই-বার, পাইবে; যাহা হইবার, হইবে। পাইবে—তোমার মাকে। হইবে—তুমি অপরাজিতা। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

স্বর্ণকলি ধর্ম্মের এই গভীর উপদেশ শুনিয়া মোহিতা লইলেন। তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন "দেব, বৃন্দাবনে ধর্ম্ম নাই, একথা কেমনে বলিব, *আপনি ত বৃন্দাবনেই আছেন!"*

ধর্ম্মাত্মা বলিলেন—আমি এই বাহিরের বৃন্দাবনে নাই—তবে একথা সত্য যে, আমার আত্মারূপ বৃন্দাবনে সদা আছি। হায়, কবে সে দিন হইবে, যে দিন, কেবল আত্মাময় বৃন্দাবনে মানুষ বিচরণ করিবে এবং প্রেমময়ী রাধার মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবে!

স্বর্ণকলি।—আপনি শ্রীমন্দিরের কৃষ্ণ রাধিকাকে মানেন না?

ধর্ম্মাত্মা।—না—মানি না। ও ধর্ম্মের বাহিরের ব্যাপার—ভিতরের ব্যাপার ইহাপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক মনোহর।

স্বর্ণকলি।—পৌত্তলিকতাতে বৈকুণ্ঠ মিলে না?

ধর্ম্মাত্মা।—না, কখনই—না। তাহাতে যাহা মিলিবার তাহাই মিলে, তাহাতে ধর্ম্ম লাভ হয়, কিন্তু মাতৃলাভ হয় না।

স্বর্ণকলি।—পৌত্তলিকেরা সকলেই তবে বৈকুণ্ঠচ্যুত ?

ধর্ম্মাত্মা।—তাহা বলি না। তবে ইহা বলি—প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত চরিত্র ভিন্ন অন্তঃপুরে যাওয়া যায় না। অন্তঃপুরের মাতৃমূর্ত্তি—চিন্ময়ী, সচ্চিদানন্দ-ময়ী,—রূপ, গন্ধ, রসের অতীত মূর্ত্তি। মানুষ তাঁহাতে মজিতে পারে, কিন্তু সে অরূপের ব্যাখ্যা হয় না। তিনি ইন্দ্রিয়াতীতা।

স্বর্ণকলি।—রূপ গন্ধ রসের অতীত মূর্ত্তিতে মানুষ মজিতে পারে ?

ধর্ম্মাত্মা।—পারে। তাহাই বৈকুণ্ঠ, তাহাই মোক্ষ। মোক্ষলাভ তাঁহারই পক্ষে সম্ভব, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। জড় জগতে তাহা লাভ হয় না। জড়ের পরিণাম জড়ই। পৌত্তলিকতার পরিণাম পুত্তলিকার পূজাই। আত্মার পূজাই পরমাত্মার রাজ্যে অথবা ধর্ম্মের অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণকলি।—এপথে যাওয়ার সহায় কে ?

ধর্ম্মাত্মা।—সহায়—ধর্ম্ম, চরিত্র এবং বিশ্বাস।

স্বর্ণকলি।—আর সহায় কি ?

ধর্ম্মাত্মা।—আর সহায়, প্রার্থনা। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, দ্বার মুক্ত হইবে।

স্বর্ণকলি আর কথা বলিলেন না। নীরবে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মাত্মার নিকট বিদায় লইলেন এবং বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন। এই দিন হইতে অবিশ্রান্ত প্রার্থনাই স্বর্ণকলির এক মাত্র সম্বল হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

দান্তার রাজ্যে কুশল নাই। রামানন্দ এবং দীননাথের মন আবার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সেবা ও লীলার সহিত বিবাহসূত্রে মিলিত হইতে উভয়ের ইচ্ছা। দান্তার সহিত মিলনের সূত্র ধরিয়া তাঁহারা এই অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। দান্তা ইহাদের মনের অবস্থা বুঝিলেন। লীলা ও সেবাও বুঝিলেন। স্বর্ণকলির চরিত্রের আদর্শে ইহাদের জীবন এখন এত উন্নত হইয়াছে যে, কুহক, মন্ত্রে আর ভুলিতে

পারেন না। রামানন্দ ও দীননাথ, এখন লীলা ও সেবা উভয়ের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন। দাস্তা প্রেমালিঙ্গনে রামানন্দ ও দীননাথকে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এখন এইরূপ পাশব ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেও আর বিরক্ত হইতে পারেন না। কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহাই ভাবিতেছেন।

ক্রমে রামানন্দ ও দীননাথের অভিসন্ধির জাল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। দাস্তার অনুচরবর্গ বুঝিতে পারিল যে, ইহারা দাস্তাকে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় তাহারা আর সুস্থ থাকিতে পারিতেছে না। তাহারা একদিন করযোড়ে দাস্তাকে বলিল, "মহারাজ, আপনার বন্ধুদের মনের গতি বড় ভাল নয়, ইহারা আপনাকে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আর ঠিক থাকিতে পারিতেছি না। আপনার অনুমতি পাইলে আমরা ইহার প্রতিবিধান করি।"

দাস্তা।—তোমাদের গভীর ভালবাসার পরিচয়ে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু বন্ধুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে আমি অনুমতি দিতে পারি না। ইঁহারা কি করেন, দেখা যা'ক।

অনুচরবর্গ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া বিদায় লইল। দাস্তা বন্ধুদের কলুষিত মনের পরিচয় পাইয়া দুঃখিত হইলেন। তিন চারি দিন পর দাস্তার দুই জন সংবাদ-বাহক একখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র লইয়া দাস্তার নিকট উপস্থিত হইল, তাহাতে এই রূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "সোনাপুরের হরিদাস এখন দ্বীপান্তরে, কিন্তু বলরাম মধুবনের নিকট দাস্তাবনে অবস্থিতি করিতেছে। এই বলরামই দাস্তা দস্যু নামে খ্যাত। এই ব্যক্তিই কলিকাতার শ্রীনাথ বাবুর হত্যাপরাধে অপরাধী। সম্প্রতি হরিদাসের ভগ্নী স্বর্ণকলিকে হত্যা করিয়া লীলা ও সেবাকে লইয়া দাস্তাবনে পরম সুখে বিহার করিতেছে। মধুবনের নিকট ২০০ শত সিপাহী উপস্থিত হইলেই আমরা দাস্তাকে ধরাইয়া দিতে পারিব।"

ইহার নীচে দীননাথ ও রামানন্দ উভয়ের স্বাক্ষর ছিল।

এই সংবাদটি পড়িয়া বলরাম বন্ধুদের তিক্ত ব্যবহারে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। দাস্তাবনে আর থাকা উচিত নয়, মনে করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য কিছু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বন্ধুদিগকে তিরস্কারাদি কিছুই করিলেন না।

সন্ধ্যার সময় সেবা আসিয়া দাস্তাকে বলিলেন,—আজ রাত্রে আপনার প্রাণ লইবার জন্য ইহারা আয়োজন করিয়াছে। চলুন, আজ পলায়ন করি।

দাস্তা অবিচলিত-চিত্ত, একটুও ভীত হইলেন না, সেবাকে বলিলেন, আমার মৃত্যু হইলেই কি তোমরা ইহাদের হইবে? আমি মনে করি, তা কখনই সম্ভব নয়। কেন বৃথা চেষ্টা!

সেবা আর কোন কথা বলিলেন না;—বলা উচিত মনে করিলেন না।

রাত্রি উপস্থিত হইল। দীননাথ আজ প্রতিশোধ তুলিবার জন্য অস্ত্র শাণিত করিয়াছে। ভয়ানক প্রতিজ্ঞা—"হয় মরিবে, নয় মারিবে।" এ প্রতিজ্ঞার সম্মুখে আজ কে আঁটিয়া উঠিবে?

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রামানন্দ মধুবনের নিকট গিয়াছে। এদিকে দীননাথ একাকী। কম সাহস নয়!

সেবা বেগতিক দেখিয়া দীননাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"চিরদিনই অধর্ম্মাচরণ করিবে? তোমার পায়ে ধরি, দেবতার প্রাণ লইও না। তা পারিবে না, তাতে তোমার বাসনাও পূর্ণ হইবে না।"

দীননাথ।—বাসনা পূর্ণ হইবে না?—তুমি আমার হইবে না?

সেবা।—কখনই না। আমার দেহমন বিক্রয় করিয়াছি। এ জীবনে আর রিপু সেবা হইবে না। আমি এখন দীন দুঃখীর।

দীননাথ।—তোমার জন্য আমি যে পাগল! তুমি আমার হইবে না?

সেবা।—সে আশা বৃথা।

দীননাথ।—তবে তোর জীবনে কাজ কি! এই অস্ত্রে তোর শির লই?

সেবা।—যেমন ইচ্ছা,—তাতেও যদি বলরাম বাবুর প্রাণ থাকে, আমার জীবন দিয়া কৃতার্থ হইব।

দীননাথ।—তোর জীবনই লইব; কিন্তু পায়ে ধরি, একটী কথা রাখ্।

সেবা।—কি কথা?

দীননাথ নির্লজ্জের ন্যায় শেষ অনুরোধ ব্যক্ত করিল।

সেবা সে কথা শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, প্রাণ থাকিতে নহে। আমাকে হত্যা করিয়া তার পর বাসনা পূর্ণ কর্।

সেবা নীরব হইলেন। পশু পশুর কাজ করিল। দীননাথের অসিতে

সেবার প্রাণ বাহির হইল। দীননাথ সেবার রক্তাক্ত কলেবরে আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করিল! এমন নরাধম আর কি জগতে মিলে?

দীননাথ তারপর সেই ভীষণ অসি হস্তে উন্মত্তের ন্যায় লীলার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"সেবার যে দশা, তোরও সেই দশা করিব; এখনও স্বীকৃত হ?"

লীলা সে ভীষণ উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইলেন, এবং বলিলেন, "আমি আসিতেছি" এই বলিয়া লীলা যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া দীননাথ লীলার হাত ধরিল। লীলা আর উপায় না পাইয়া চীৎকার করিলেন।

চীৎকারে দাস্তার জাগরিত অনুচরবর্গ ছুটিয়া আসিল। তাহারা দীননাথের রক্তময় দেহ দেখিয়া বড়ই বিপদ গণনা করিল। তাহারা ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। অপেক্ষা না করিয়া দীননাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, অস্ত্র রাখ্, নচেৎ এখনই তোর প্রাণ লইব।

দীননাথ।—আমি স্ত্রীলোকের রক্তে পিপাসা মিটাইয়াছি,—আয়, এখন পুরুষের রক্তে পিপাসা মিটাই।

অনুচরবর্গ।—আমরা অসভ্যজাতি, বাঙ্গালীকে ভয় করা কাপুরুষের কাজ। এখনই তোর প্রাণ লইব, ক্ষান্ত হ।

দীননাথ আর অপেক্ষা না করিয়া আপন হাতের অসি সজোরে নিক্ষেপ করিল। দাস্তার অনুচরবর্গের মধ্যে একজন অতি আশ্চর্য্য কৌশলে সে আক্রমণ এড়াইয়া নিমেষের মধ্যে দীননাথকে ধরিয়া ধরাশায়ী করিল, এবং বলিল, এখন? এখন প্রাণ লই?

লীলা বলিলেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, বাবুকে ডাকিয়া আনিতেছি।

লীলা এই বলিয়া বলরামকে ডাকিতে চলিলেন। যাইবার সময় সেবাকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু সেবা মৃতা, সর্ব্ব শরীর রক্তে সিক্ত! সেবার সে ভীষণ অবস্থা দেখিয়া লীলার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল —পাগলের ন্যায় বলিলেন,—"সেবা তুইও গেলি?—এই দগ্ধ পৃথিবীতে আমার আর আপনার বলিবার কেহ রহিল না?" লীলা সেবার মুখ চুম্বন করিলে, পদধূলি মাথায় দিলেন। এবং বস্ত্রাদি সমান করিয়া রাখিয়া বলরামকে ডাকিতে গেলেন। বলরাম জাগরিত হইয়া শীঘ্র

তাহে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, এবং লীলার সহিত দীননাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দীননাথ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই বুঝিয়া, দাস্তাকে দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল—"বলরাম বাবু, তোমার চরণে শত অপরাধী, অন্তিমে আজ ক্ষমা চাই।"

বলরাম অনুচরবর্গকে বলিলেন, দীননাথকে ছাড়িয়া দাও।

দীননাথ মুক্ত হইয়াই বলরামকে আক্রমণ করিল এবং বলিল,—"তোর রক্তপানের জন্যই আমি জীবিত আছি, দেখি আজ তোকে কে রাখে? এই বলিয়াই দীননাথ সজোরে বলরামের গ্রীবা ধারণ করিল এবং বলিল— 'আজ সেবার রক্তে তোর রক্ত মিশাইয়া সেবা-হরণের প্রতিশোধ তুলিব!"

মানুষের জ্ঞান গরিমার সীমা আছে, কিন্তু ধৃষ্টতা, মূর্খতার আর শেষ নাই। দীননাথ আজ সিংহের গ্রাসে পড়িয়াও এইরূপ আস্ফালন করিতেছে। ধন্য মূর্খতা, বলিহারি যাই!

বলরাম দীননাথকে কোন কথা বলিলেন না, অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন—"স্থানান্তরে লইয়া যাইয়া যাহা করিতে হয় কর।"

দীননাথের লাঞ্ছনার আর কিছুই বাকী রহিল না। সেবার রক্তপান করান হইল এবং সেই রাত্রেই দীননাথকে জীবিত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইল।

পরদিন সেবার দেহ অতি সমারোহের সহিত দাস্তাবনে দাহ করা হইল। সপ্তাহের মধ্যে একটি সুন্দর প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তার উপরে "সেবার সমাধি" এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখা হইল। সেই মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই দিন হইতে যথারীতি পূজার ব্যবস্থা হইল।

বলরাম সেবার এই শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া বড়ই কাতর হইলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামানন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। মধুবনের নিকটস্থ ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যখন রামানন্দ পুলিসের লোক সহ দাস্তাবনে আগমন করিতেছিলেন, তখন সদলে তিনি দাস্তার লোকের হাতে নিধন হইলেন। সকল মৃতদেহ দীননাথের চতুষ্পার্শ্বে প্রোথিত করা হইল এবং দীননাথ ও রামানন্দের সমাধির উপর অখণ্ড প্রস্তর-ফলক সংস্থাপিত হইল। তাহাতে লেখা রহিল——"অস্পৃশ্য বিশ্বাসঘাতকদিগের সমাধি।"

দাস্তা এইরূপে শত্রুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু স্বর্ণকলি

ও হরিদাসের জন্য দিন দিন গভীর মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি স্বর্ণকলির অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে যে সকল অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া তাহারা প্রায় সকলেই ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেহই বিশেষ কোন সংবাদ আনিতে পারে নাই। বৃন্দাবন হইতে একজন সংবাদ আনিয়াছে যে, "স্বর্ণকলি কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে এখন যেন আর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" আর একজন লোক সংবাদ আনিয়াছে যে, "বৈদ্যনাথের নিকটস্থ তপোপাহাড়ে একজন তপস্বিনী আসিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম কেহ জানে না, কিন্তু বৃন্দাবন হইতে আগত কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে "অপরাজিতা দেবী" বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। তপস্বিনীর বাড়ী কোথায়, জানা যায় না, কিন্তু আকৃতি কতকটা দেবী স্বর্ণকলির ন্যায়।"

এই সংবাদ পাইয়া বলরাম ও লীলা দাস্তাবন পরিত্যাগ করিয়া তপো-পাহাড় উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, স্বর্ণকলি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার বাহ্যমূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তপোপাহাড়ে উপস্থিত হইয়া বলরাম দেখিলেন, তপস্বিনী বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থা রহিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দর্শক, মধ্যস্থলে বহুসাধু মহাত্মা-দিগের সমাধি-বেষ্টিত "হরিদাস ও বলরাম মূর্ত্তি।" সাধারণ লোকেরা উভয়-মূর্ত্তিকে কৃষ্ণ বলরাম বলিয়া সম্বোধন করে। লীলা ও বলরাম তপস্বিনীর সেই স্বর্গীয় কান্তি, সেই অপরূপ শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন। স্বর্ণকলিকে চিনিতে ভুল হইল না। সেই অপরাজিত স্নেহ-বিগলিত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা স্বর্গের সুখ পাইলেন।

যথা সময়ে দেবীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন, সেখানে আর অন্য লোক নাই, রাত্রি সমাগত দেখিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। দেবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?" দেবী অন্ধকারে ইহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই।

বলরাম বলিলেন,—আমার নিবাস সোনাপুর, সম্প্রতি দাস্তাবন হইতে আসিয়াছি। আমার নাম বলরাম—সঙ্গে লীলা।

দেবী স্বর্ণকলি প্রদীপ জ্বালিলেন, তৎপর বলরামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও লীলাকে অভিবাদন করিলেন, তারপর বলিলেন, সেবা কোথায়?

বলরাম, ধীরভাবে সেবা, রামানন্দস্বামী ও দীননাথের কথা আমূল বলিলেন।

সে সকল কথা শুনিয়া স্বর্ণকলির হৃদয় উদ্বেলিত হইল—দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল।

বলরাম বলিলেন,—যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চলুন, আমরা সোনাপুর যাই।

স্বর্ণকলি।—আমি বুঝিয়াছি, সোনাপুরে আমার আর স্থান নাই—দাদার কথা তখন শুনিলে আমার দাদাকে বুঝিবা হারাইতাম না!

বলরাম।—পিতৃ মাতৃ ধামের মমতা ভুলিবেন?

স্বর্ণকলি অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, মাতৃধাম এখন আমার হৃদয়, পিতৃধাম স্বর্গ। ভ্রাতৃধাম এই তপোপাহাড়। ভ্রাতৃধামের সাধনে সিদ্ধ হইলেই পিতৃধাম অথবা মুক্তিধামে যাত্রা করিব।

বলরাম।—ইহাকে ভ্রাতৃধাম বলিতেছেন কেন?

স্বর্ণকলি সাশ্রুনয়নে গদ্গদচিত্তে বলিলেন, ঐ দেখুন, এইধামে অতি মধুর, অতি পবিত্র ভ্রাতা হরিদাস ও ভ্রাতা বলরামের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সেবা ও পূজা অর্চ্চনা করাই এখন আমার প্রধান ধর্ম্ম।

বলরাম স্বর্ণকলির সে স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয়ে অবাক্ হইলেন, এ কি পৃথিবী না স্বর্গ, ক্ষণকাল এই সন্দেহ হইল। আমার ন্যায় নরাধমকেও দেবী ভ্রাতার পার্শ্বে রাখিয়াছেন! ভাবিতে ভাবিতে বলরামের দুনয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল।

বলরাম ক্ষণকাল আর কথা বলিতে পারিলেন না; স্বর্ণকলি গত এক বৎসরের সমস্ত কথা বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া বলরাম বুঝিলেন বাস্তবিকই স্বর্ণকলি দেবী, মানবী নহেন। বলরাম মোহিত হইলেন।

স্বর্ণকলি বলিলেন,—শ্রীনাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় কি হইল?

বলরাম।—সে সমস্ত অনাথ-আশ্রমের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। আপনার নামে তাহা উৎসর্গ হইয়াছে।

স্বর্ণকলি একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন, তারপর বলিলেন, সোনাপুরের আশ্রমের কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?

বলরাম।—পাইয়াছি। বিশ্বনাথ বাবু আপনার সকল কীর্ত্তি বজায় রাখিয়াছেন।

স্বর্ণকলি শুনিয়া বলিলেন—বিশ্বনাথ বাবু আমার পিতৃস্থানীয়, তিনি নর-হরি, তাঁহার ভালবাসা কখনও ভুলিতে পারিব না।

এইরূপ কথা বার্ত্তায় অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইল। গভীর রাত্রে স্বর্ণকলি উভয়ের চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন—"আপনারা এখন গমন করুন। দাদার মুক্তি-সংবাদ পাইলে আবার আমার সংবাদ লইবেন।" তারপর বলরামকে বলিলেন, আপনার নিকট শেষ অনুরোধ এই,—আপনি জন্মদুঃখিনী লীলার পাণিগ্রহণ করুন। অবিবাহিত থাকিলে মানুষের জীবনে নানা অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়। আপনি ভিন্ন লীলার আর কে আছে?"

বলরাম, স্বর্ণকলির কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, অনভিপ্রেত হইলেও প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই রাত্রেই তপোপাহাড় মধুময় হইল—মধুর মিলনের মন্ত্র স্বর্ণকলি নিজে পাঠ করিলেন। উভয়ের গলায় প্রেম-মালা পরাইয়া দিলেন, তারপর বলিলেন,—"আজ আপনারা গমন করুন। দাদার মুক্তি-সংবাদ পাইলে পুনঃ দেখা করিবেন। নচেৎ আর সাক্ষাৎ হইবে না। শেষ অনুরোধ এই,—এখন লীলাকে লইয়া দাস্তাবন পরিত্যাগ করিয়া সোনাপুরে যাইয়া বাস করুন। সোনাপুর আর কত দিন রত্নহীন থাকিবে?"

বলরাম বলিলেন,—সোনাপুরে কি করিয়া এ মুখ দেখাইব? আমার অপরাধ কি দেশের লোকেরা ভুলিতে পারিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট কি আমাকে ক্ষমা করিবেন?

স্বর্ণকলি বলিলেন,—আপনার মহত্ত্বের কথা শুনিলে বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত বিগলিত হইবে। আমি জানি না, কোন্ অপরাধে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে শাস্তি দিবেন? এখন দীননাথ, রামানন্দ ও শ্রীনাথ বাবু নাই, কে আর মিথ্যা সাক্ষী দিবে? আপনার ন্যায় দেবতাকে অপরাধী বলিতে এখন পশুপক্ষীও ভীত হইবে। আপনার যে কিছু পাপ ছিল, সে সমস্ত বিধৌত হইয়াছে, এখন নির্ভয় অন্তরে সোনাপুর গমন করুন, কেহ কিছু বলিবে না, কেহ কিছু করিবে না।

স্বর্ণকলির এইরূপ সাহসপূর্ণ কথায় আশ্বস্ত হইয়া, এবং অধিক পীড়াপীড়ি করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া অবশেষে গভীররাত্রে বলরাম ও লীলা নবপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তপোপাহাড় পরিত্যাগ করিলেন। পথে বলরাম ও

কারী নহেন। তিনি এখন মুক্তি-নীলাচলে মহা সমাধিতে নিমগ্না।

হরিদাস বা বলরাম এই সকল কথার কোনই অর্থ বুঝিলেন না। বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন আর কিছু জানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা, দুঃখকে জীবনের সম্বল করিয়া কলিকাতায়, এবং তৎপর সোনাপুর, গমন করিলেন। সোনাপুরে যাইয়া তাঁহারা দেখিলেন—সকলের কণ্ঠে স্বর্ণকলির কথা, সকলের হৃদয়ে স্বর্ণকলির ভালবাসা। স্বর্ণকলি যেন সকল ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেন ঘরে ঘরে বিরাজিতা।

বলরাম স্বর্ণকলির জীবনের অবশিষ্টাংশ সকলের নিকট বিবৃত করিলেন। সে সকল কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ মোহিত হইল এবং বলিতে লাগিল,"এমন মেয়ে আর দেখি নাই, ইহার আবির্ভাবে সোনাপুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। স্বর্ণকলি মানবী নহেন, দেবী।" হরিদাস ও বলরামকে পাইয়া বিশ্বনাথ রায় যেন বৈকুণ্ঠের চাঁদ হাতে পাইলেন। আনন্দের কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল।

হরিদাস ও বলরামের প্রতি এখন আর কাহারও শত্রুতা নাই। বিশ্বনাথ রায়ের আনন্দের শেষ নাই। কিন্তু সকলের মুখে এই এক মর্ম্মভেদী কথা—"সোনাপুর ভূষণহীনা, সোনাপুর স্বর্ণকলি অভাবে শ্মশানপুর।"

হরিদাস ও বলরাম শ্রীনাথের উইলানুসারে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকায়, সেই ক্ষুদ্র নদীর ধারে, স্বর্ণকলির মাতৃশ্মশানে একটি প্রকাণ্ড অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আশ্রমের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল—

"অপরাজিতার অনাথ-আশ্রম।"

এই পৃথিবীতে অপরাজিতার গুণ রহিল বটে, কিন্তু সে স্বর্গীয়রূপ আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অপরাজিতা—দেবলোকে কি নরলোকে? কে বলিতে পারে?

সমাপ্ত।

লীলা, স্বর্ণকলি সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। নারীবেশে লোক-শিক্ষার জন্য অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হইয়াছেন, উভয়ের দৃঢ়বিশ্বাস হইল। স্বর্ণকলি এত সংগ্রামেও অপরাজিতা রহিয়াছেন, ভাবিতে ভাবিতে উভয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু হইতে জল পড়িল। তাঁহারা যথাসময়ে দাস্তাবনে পৌঁছিলেন। বলরাম অসভ্য জাতির মঙ্গলের জন্য "অপরাজিতা-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রধান অনুচরকে কর্ত্তৃত্বপদে বরণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে সমস্ত সংবাদ পত্র হরিদাস সম্বন্ধে আন্দোলন করিলেন। এই আন্দোলনে কতকটা সুফল ফলিল। ইতি পূর্ব্বেই আণ্ডামানের কয়েদীর রিপোর্টে হরিদাসের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এই আন্দোলনে খুব সুফল ফলিল। অবশেষে ১২৮৩ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের সময়ে হরিদাস কারামুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। বলরাম পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি যথা সময়ে হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। লীলা ও বলরামের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া হরিদাস যারপর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। স্বর্ণকলির অমানুষিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মানুরাগ, দুঃখীর প্রতি দয়া, অপরাধীর প্রতি ক্ষমার কথা শুনিয়া তিনি মোহিত হইলেন। পরদিন ব্যাকুলচিত্তে হরিদাস, লীলা ও বলরামের সহিত তপোপাহাড়ে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে ইঁহারা সেখানে পৌঁছিলেন,—কিন্তু স্বর্ণকলির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, সেখানে হরিদাস ও বলরামের মূর্ত্তি রহিয়াছে, শত সহস্র লোকের সমাগম আছে, কিন্তু স্বর্ণকলি নাই। তিনি একমাস যাবত কোথায় গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। দেখিলেন, সকলেই আশাপূর্ণ-নয়নে পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্বর্ণকলিকে না পাইয়া হরিদাস ও বলরাম উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। বৃন্দাবনের সেই পরম ধার্ম্মিক পুরুষের নিকট গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "কয়েক দিন পূর্ব্বে অপরাজিতা আমার এখানে একবার আসিয়াছিলেন। তিনি বাহিরের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া এখন মুক্তিধামে আছেন। কতদিন পর ফিরিবেন, জানি না। তবে ইহা জানি, বিশ্বাসে অটল এবং চরিত্রে দৃঢ় না হইলে সেই পুণ্যবতী, ধর্ম্মশীলা কুমারীর সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি প্রতি ঘরে বিদ্যমানা, কিন্তু বাহ্য চক্ষে তাঁকে দেখা যায় না। অপরাজিত ব্যক্তি ভিন্ন "অপরাজিতার" রূপ লাবণ্য দেখিতে কেহই অধি-

THE REAPER AND THE FLOWERS.

THERE is a reaper, whose name is Death,
And, with his sickle keen,
He reaps the bearded grain at a breath,
And the flowers that grow between.

"Shall I have nought that is fair?" saith he;
"Have nought but the bearded grain;
Though the breath of these flowers is sweet to me,
I will give them all back again."

He gazed at the flowers with tearful eyes,
He kissed their drooping leaves;
It was for the Lord of Paradise
He bound them in his sheaves.

"My Lord has need of those flowerets gay,"
The Reaper said, and smiled;
"Dear tokens of the earth are they,
Where he was once a child.

"They shall all bloom in fields of light,
Transplanted by my care;
And saints, upon their garments white,
These sacred blossoms wear."

And the mother gave, in tears and pain,
The flowers she most did love:
She knew she should find them all again
In the fields of light above.

Oh, not in cruelty, not in wrath,
The Reaper came that day;
"'Twas an angel visited the green earth
And took the flowers away.

Longfellow.

পবিত্র-স্মৃতিময়ী অপরাজিতা।

যার জন্য এত আয়োজন, সে বুকভরা আশায় শ্মশান-ভরা ছাই ঢালিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। পিতৃস্নেহের ফুল্ল কুসুম, মাতার হৃদয়ের সুধা-বিনিন্দিত অমূল্য রত্ন,—সেই অপরাজিতা; পৃথিবীর লীলা, মাটীর খেলা সাঙ্গ করিয়া এখন মুক্তিধামের নিভৃত কন্দরে মহা নিদ্রায় শায়িতা রহিয়াছে। সে আর জাগিবে না,—আর হাত নাড়িয়া আকাশের চাঁদ ডাকিবে না, অবিভেদে ভাল মন্দ সকল দ্রব্য মুখে তুলিবে না,—সেই অমিয়া-ময় মুখে আর হাসিবে না,—মধু-ভরে আধ আধস্বরে মুখ নাড়িয়া কথা বলিয়া আর তাপিত হৃদয়ে শান্তি ঢালবে না। পাপ প্রলোভনময় সংসার-মরুতে পরাজিতা হইবার ভয়ে সে আভাময়ী সোণার প্রতিমাকে বিশ্বজননী মুক্তিধামে গ্রহণ করিয়াছেন! সে গিয়াছে,তবে এই আয়োজন কারজন্য? এঅপরাজিতা আর কাহাকে অনুপ্রাণিত করিবে?—কাহাকে চালাইবে?—কাহাকে পথ দেখা-ইবে?—এ মর্ম্মভেদী কথার উত্তর না পাইয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছি। প্রতিমা বিসর্জ্জিতা হইল ত এ ছায়া রহিল কেন? স্মৃতি রহিল কেন? ভালবাসার মায়া রহিল কেন?—নয়নে অশ্রু রহিল কেন?—গেল ত সব গেল না কেন? এ কথার উত্তর মিলে না। সূর্য্য ডুবিলেও তার শেষ আভা থাকে, ফুল শুকাইলেও একটু সৌরভ থাকে, প্রত্যক্ষ ফুরাইলেও মোহময় স্বপ্ন থাকে, রূপ ডুবিলেও তার স্মৃতি জাগে,—কেবল মানু-ষকে জ্বলাইতে পোড়াইতে! সে অপরাজিতা গেল ত এ অপরাজিতা রহিল কেন? এক বোঁটায় দুটি ফুল;—একটি কায়া, একটি ছায়া। কায়া ঝরিল ত এ ছায়া রহিল কেন? দীপ নিবিল ত এ নিষ্প্রভ জ্যোতি রহিল কেন? চাঁদ ডুবিল ত এ সুষমা রহিল কেন? কার জন্য রহিল, জানিনা। তবে ইহা জানি, পিতা মাতাকে কাঁদাইতে, এই স্মৃতি-ছায়া জগতে রহিল। এ স্মৃতি কাহাকেও যে আর অনুপ্রাণিত করিবে, সে আশা ডুবিয়াছে। বুঝিয়াছি, এ ছায়ার মায়ায় মোহিত হইবার জন্য সেই অনুপম কায়া আর মহা নিদ্রা হইতে জাগিবে না। এখনকার দিনে ইহার ভাগ্যে রহিল কেবল নিরাশা, কেবল অন্ধকার, কেবল হাহাকার! আর কি রহিল? মানুষ তাহার কোনই খবর বলিতে পারে না। বাজিকরের অপূর্ব্ব বাজী!

১২ই ফাল্গুন, ১২৯৬।